দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মুখোশ খুলে গেছে তাই চার্চ কাঁদুনি গাইতে ব্যস্ত
— পৃঃ ১৫

মূলে টান পড়ায় পাদ্রিদের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে
— পৃঃ ৪৩

৭০ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ২৫ জুন ২০১৮।। ১০ আষাঢ় - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

সব খেলার সেরা খেলা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১০ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৫ জুন - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

কংগ্রেসকে বাইরে রেখে বিরোধী জোট নয়, মমতাকে সাফ জানালেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী □ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : দিদির জন্য তিনটি সংলাপ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কৃষকদের দুঃখ মোচনে বিকল্প পন্থা প্রয়োজন □ প্রেরণা শর্মা সিংহ □ ৮

মিথ্যা, মিথ্যা, শুধুই মিথ্যা □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১১

খ্রিস্টান জঙ্গিবাদের পথে বাধা মোদী, তাই ক্ষিপ্ত ভ্যাটিক্যান □ নীতীন রায় □ ১৩

মুখোশ খুলে গেছে তাই চার্চ কাঁদুনি গাইতে ব্যস্ত □ বলবীর পুঞ্জ □ ১৫

বাংলাদেশে দেবোত্তর ভূমি গ্রাস করার উদ্যোগ সমানে চলছে □ ১৬

স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্য □ বাবাসাহেব আপ্তে □ ১৭

কে জিতবে বিশ্বকাপ? □ জয়ন্ত চক্রবর্তী □ ২৩

স্বপ্ন দেখাচ্ছে সুনীলের ভারত □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২৪

খালি পায়ের খেলোয়াড় তাই খেলা হলো না মান্নার □ অনুপম দাশগুপ্ত □ ২৫

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীতজ্ঞান □ তপন মল্লিক চৌধুরী □ ২৬

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক □ ডা: শচীন্দ্রনাথ সিংহ □ ৩১

প্রাচীন রাজবংশ কলচুরি (চদি) □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৩

গল্প : জন্মজন্মান্তর □ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

মূলে টান পড়ায় পাদ্রিদের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** □ **চিত্রকথা : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
২ জুলাই, '১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

প্রকাশিত হবে
২ জুলাই, '১৮

জিন্নার গ্রাস থেকে বাঙালি হিন্দুর নিজস্ব বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনার পর শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, জিন্না ডিভাইডেড ইন্ডিয়া, আই ডিভাইডেড পাকিস্তান। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম না হলে বাঙালি হিন্দুর অবস্থা হতো করুণ। হয়তো অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতো। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গেই তাঁকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা সবথেকে বেশি চোখে পড়ে। কিন্তু মানুষ যাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ-চর্চা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য স্বস্তিকা জন্মাবধি চেষ্টা করে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবস। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাটি তাই শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে। লিখবেন— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজয় আঢ্য, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নীতি আয়োগের চতুর্থ বৈঠক

যোজনা কমিশনের অবলুপ্তির পরে নীতি আয়োগ গঠিত হইলে তাহা কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহার অগ্নিপরীক্ষা ছিল গত ১৭জুন, ইহার চতুর্থ গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে। এককথায় বৈঠকটির সাফল্য চমকপ্রদ। কেননা অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যের তাবড় মুখ্যমন্ত্রীগণ স্বয়ং ইহায় যোগদান করিয়া নীতি আয়োগের কার্যকারিতাকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাহা না করিয়া নিজেদের প্রতিনিধিদের এহেন বৈঠকে প্রেরণ করিয়া বিষয়টিকে লঘু করিবার যে কু-প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহা এইবার দেখা যায় নাই। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে নিশ্চিত সুখের বিষয়। নীতি আয়োগের কর্মপ্রয়াসকে নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন করিবার অপপ্রয়াস হইতে আঞ্চলিক দলগুলি যে বিরত হইয়াছে, তাহাও কম স্বস্তির বিষয় নহে। পরিস্থিতি অনুকূল বুঝিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের ডাক দিয়াছেন, ইহার পূর্বে পণ্য পরিষেবা কর চালু করিয়া 'এক দেশ, এক কর' ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অর্থানতিক ঐক্যের পথ সুগম হইয়াছিল। তেমনি দেশের লোকসভা ও বিধানসভার ভোট একই সময়ে সংঘটিত হইলে 'এক দেশ, এক ভোট' নীতির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই রাজনৈতিক ঐক্যের পথটি যে নেহাত কুসুমাস্তীর্ণ নহে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা, কোনওটিই ভারতবর্ষের আঞ্চলিক দলগুলির যে নাই তাহা বোঝা গিয়াছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি আজ সুবিধাবাদী আঞ্চলিক দলগুলিকে হাতে হাত মিলাইতে বাধ্য করিলেও ইহাদের লক্ষ্য যে ঘোলা জলে মাছ ধরা তাহা কেরলের বাম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতাতেই প্রমাণিত হইতেছে। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাহাতে দিল্লিতে বাম-তৃণমূল আঁতাত যে সুবিধাবাদী রাজনীতিরই ফসল, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু সমস্যা হইতেছে যে, নীতি আয়োগের উদ্দেশ্য হইল দলীয় রাজনীতি ব্যতিরেকে দেশকে উন্নতির শিখরে লইয়া যাওয়া। কিন্তু যখন ইহাতে রাজনৈতিক ফললাভে মোক্ষটি বলবতী হয়, তখন দেশের পক্ষে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ অপসৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বছর বছর বিধানসভার নির্বাচন করিতে হইলে দেশের আর্থিক কোষাগারে কীরূপ অমানবিক নির্যাতন হয়, ইহা বুঝিবার জন্য অর্থনীতিবিদ্যা অধ্যয়ন না করিলেও চলে। লোকসভা ভোটের সঙ্গে বিধানসভার ভোট হইলে কেবল যে দেশের আর্থিক কোষাগার লাভবান হইয়া আমাদের অর্থনীতির ফাঁসটি আলগা হইবে তাহাই নহে, রাজনৈতিক সমতার একটি মাপকাঠিও মিলিবে। না হইলে বারংবার লোকসভায় একক ও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দেশের অর্থনীতিকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবার যাবতীয় স্বপ্নের অকালপ্রয়াণ ঘটিবে সংসদের উচ্চকক্ষে আসিয়া। গণতন্ত্রের পক্ষে যে ইহা শুভ বিজ্ঞাপন নহে, তাহা বলিয়া দিতে হয় না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হইল, কেন্দ্রকে এইভাবে জব্দ করিবার সুযোগ পাইয়া আঞ্চলিক দলগুলি কংগ্রেসের মদতে দেশের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বারংবার বিব্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের 'রাজ্যের ক্ষমতায়ন'-এর বিষয়টি এক্ষেত্রে অজুহাত মাত্র, মূল লক্ষ্য কেন্দ্রের দাদাগিরির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ তুলিয়া রাজ্যে রাজ্যে নিজেদের মাতব্বরি বজায় রাখিয়া কেন্দ্রে কগ্রেসের ন্যায় তাঁবেদার সরকারকে পরিচালন করা। নীতি আয়োগকে অপ্রাসঙ্গিক করিবার চেষ্টা তাহাদের বিফলে গিয়াছে, ২০১৯-এর পর আঞ্চলিক দলগুলিকেই অপ্রাসঙ্গিক করিতে দেশবাসী যত্নের ত্রুটি করিবেন না, এই বিশ্বাস আমাদের রহিয়াছে। আপাতত 'এক দেশ এক ভোট' না হউক, তথাপি লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচক মণ্ডলীর একটিমাত্র তালিকা তাহারই সূচনা মাত্র। বাকিটা ক্রমশ হইবে।

সুভাষিতম্

শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশি, শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ, পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।।

চাঁদ আছে বলেই রাত্রির শোভা, আবার রাত্রি আছে বলেই চাঁদের শোভা। আর উভয়ের জন্য আকাশের শোভা বৃদ্ধি পায়। জল আছে বলেই পদ্মের শোভা আর পদ্ম আছে বলেই জলের শোভা। আর উভয়ের জন্যই জলাশয়ের শোভা বৃদ্ধি পায়।

কংগ্রেসকে বাইরে রেখে বিরোধী জোট নয়, মমতাকে সাফ জানালেন কর্ণাটক মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী

সংবাদপত্রে দেখলাম, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চারটি প্রধান অস্ত্র নিয়ে বিরোধীদের মোকাবিলা করবে। এই চারটি অস্ত্র হচ্ছে— পরিবারতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র, সুশাসন বনাম দুর্নীতি , উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বনাম অনাচার এবং নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প কোনও নেতা। এই চারটি প্রশ্নের জবাব শুধু বিরোধীদেরই নয়, আম জনতাকেও দিতে হবে। পরিবারতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের প্রশ্নে শুধু কংগ্রেস নয়, অধিকাংশ বড়ো দলগুলি বিপদে পড়ে যাবে। কংগ্রেসে যেমন নেহরু-গান্ধী পরিবার, তেমনি সমাজবাদী পার্টিতে মুলায়ম সিংহ পরিবার, আর জে ডি-তে লালুপ্রসাদ, ডি এমকে-তে করুণানিধি, ন্যাশনাল কনফারেন্সে ফারুক আবদুল্লা, জে ডি এস দলে এইচ ডি দেবেগৌড়ার পরিবার দলের জমিদারি চালাচ্ছে। রাহুল যেমন স্রেফ গান্ধী পরিবারের নাম ভাঙিয়ে বিনা নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতি বনে গেলেন, তেমনি অখিলেশ, স্ট্যালিন, তেজস্বী,ওমর— তাঁদের বাবাদের নাম ভাঙিয়ে দলের সভাপতি। বিজেপিতে পরিবারের জোরে দলের শীর্ষপদ দখল করা যায় না। বিজেপিতে একদা দরিদ্র চা-ওয়ালার ছেলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সাধারণ ঘরের সন্তান অমিত শাহ বিজেপি সভাপতি হন। ত্রিপুরায় অপরিচিত নেতা বিপ্লব দেব পরিবারের আশীর্বাদ বা ঐতিহ্য ছাড়াই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। প্রভাবশালীদের পায়ে মাথা ঠেকাতে হয় না।

সব থেকে বড়ো কথা, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদে বিরোধীদলের কেউ মানছেন না। সকলেই বলছেন, রাহুল নিজের দল চালাতে পারেন না। তিনি দেশ চালাবেন কীভাবে? তবে কে? মায়াবতী ও মমতা দুজনেই রাজ্য চালাতে হিমসিম খেয়েছেন এবং খাচ্ছেন। একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে মমতা যেভাবে হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন তারপর সারা দেশের মানুষ তাঁকে আর শান্তি ও স্বচ্ছতার প্রতীক বলে মনে করেন না। সাদা শাড়ি আর সাদা হাওয়াই চটি পরে ঘুরলেই রক্তের দাগ মোছা যায় না। মোদী বনাম রাহুল হলে বিজেপি হাসতে হাসতে জয়ী হবে। একটা কথা ভুললে চলবে না, আঞ্চলিক দলের নেতা-নেত্রীরা নিজ রাজ্যে যতটা দাপুটে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তা নয়।

গূঢ়পুরুষের কলম

সুশাসন বনাম দুর্নীতির বিষয়টি কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের সময় মোদীজী তুলেছিলেন। এটা ঠিক যে, বিরোধীদলের বড়ো বড়ো নেতারা আজ দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন। একদা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আম আদমি পার্টি গড়ে দিল্লিতে সরকার গঠন করেন। সেই দলের নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির অভিযোগে আসামী। মুলায়ম ও মায়াবতীর বিরুদ্ধে তাঁদের আয়ের অতিরিক্ত সম্পদ গোপন করার অভিযোগে আদালতে মামলা হয়েছে। লালু দুর্নীতির কলঙ্ক মাথায় নিয়ে এখন জেলবন্দি। উন্নয়ন নরেন্দ্র মোদীর বড়ো হাতিয়ার। উন্নয়নের সুফল পেয়েছেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। একটা বড়ো কথা মানতেই হবে, আঞ্চলিক জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে দেশের বারোটা বেজে যাবে। কারণ জোটের শরিকরা সকলেই চাইবে তাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সবথেকে বেশি হোক। ধরুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হলেন, তিনি কী করবেন? কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রক নিজের হাতে রাখবেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গে তাঁর আমলে নেওয়া কয়েক লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করবেন।বিজেপি শাসিত কোনও রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যাবে না। সোজা কথায়,আঞ্চলিক দলের জোট নির্বাচনে জিততে পারে, কিন্তু স্থায়ী সরকার দেশকে দিতে পারে না। পারা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক পণ্ডিত কলমচিরা খবরের কাগজে, পত্রপত্রিকায় বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, ২০১৪ সালে প্রবল মোদী ঝড়ে বিজেপি মাত্র ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়েছে। কারণ ৭০ শতাংশ ভোট বিভক্ত বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। তাই এবার বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হলে কেন্দ্রে বিজেপি হারবে— এটা সোনার পাথর বাটির কল্পনা। সর্বসম্মত বিরোধী ঐক্য ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে সরম্ভব নয়। দু'একটি উপনির্বাচনে যা সম্ভব, সারা দেশে তা অসম্ভব। হাতেগরম প্রমাণ হলো, মমতা দিল্লি গেলেন কেন্দ্রের নীতি আয়োগের বৈঠক করতে। উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে অ-বিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাঁর সাধের ফেডারেল ফ্রন্ট গঠন করার পক্ষে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে আসা। সেটা সম্ভব হয়নি। মমতা কেরলের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে টোপ দিয়েছিলেন। পিনারাই টোপ গেলেননি। বলেছেন— আদর্শ বিরোধী দুর্নীতিগ্রস্ত দলের সঙ্গে জোট সম্ভব নয়। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী বলেছেন --- কংগ্রেসের সৌজন্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনি রাহুল গান্ধীর পরামর্শ মেনেই চলবেন।

এদিকে মমতা প্রবলভাবে রাহুল বিরোধী। রাহুলও মমতাকে পছন্দ করেন না। মমতা চাইছেন— কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোট করা। পশ্চিমবঙ্গে মমতা কংগ্রেস ও বামেদের একটিও আসন ছাড়বেন না। যদি অ-বিজেপি, অ-বাম জোট হয় তবে সেই জোটে আস্থা রাখবে না মানুষ। রাখার কথাও নয়। পশ্চিমবঙ্গে মায়াবতী-অখিলেশের যেমন সামান্যতম প্রভাব নেই, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে তৃণমূল ও নেত্রীকে কটা লোক চেনে! ত্রিপুরা বিধানসভার ভোটে সমস্ত তৃণমূল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বাংলাভাষী ত্রিপুরাতে যদি এই হাল হয় তবে অন্য রাজ্যে তৃণমূলের কী হাল হবে ভাবুন তো!

দিদির জন্য তিনটি সংলাপ

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো
তৃণমূল ভবন, তপসিয়া, কলকাতা

দিদি,

ঝগড়া কি থামবে না! না, দিদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা বলছি না। পারিবারিক কেচ্ছার কথা বলছি। সত্যি দিদি, ভালো লাগছে না। ভাবতেই ভালো লাগছে না। অশ্লীল ঝগড়াটা একদম ভালো লাগছে না।

দিদি, আপনি তো চিরকাল সিপিএমকে নকল করে এসেছেন। ভোটে রিগিং থেকে কেন্দ্রকে দোষারোপ, কেন্দ্রের টাকা চুরি থেকে রাজ্যের কোষাগার ফাঁকা করে দেওয়া সবেতেই আপনি, আপনার দল, আপনার সরকার সিপিএম-এর জেরক্স কপি। তাই একটা পরামর্শ দিচ্ছি। পাড়া ঘরে দেখেছি, বাড়িতে বর-বউয়ের সমস্যা হলে সিপিএম ঘরে ঢুকে পড়ত। মিটিং, সিটিং করে মিটিয়ে দিত। আপনি এই ব্যাপারটাও একটু করুন না প্লিজ। বেশি করতে হবে না। বেহালার একটা ফ্যামিলি ড্রামা, সরি, কেচ্ছা সবার মুখ পোড়াচ্ছে। আসলে দিদি আপনার আশীর্বাদে ওই ফ্যামিলির গৃহকর্তা আবার কলকাতার মহানাগরিক।

দিদি কেচ্ছাটা কেমন তিনটে সংলাপ পড়লেই জানতে পারবেন।

রত্না চট্টোপাধ্যায়

''বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহিলার খপ্পর থেকে শোভন চট্টোপাধ্যায় বেরিয়ে সুপথে ফিরুন, সেটা চাই। বৈশাখীর জন্য শোভনের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার পথে। তৃণমূল নেতৃত্ব শোভনের উপর নন, বৈশাখীর উপর ক্ষিপ্ত। ওই মহিলা শোভনের থেকে প্রচুর টাকা, গয়না নিয়ে সরে যাবেন, তখন পথে এসে দাঁড়ানো শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ঘরে ফিরিয়ে আনব। উনি আমাদেরই, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা পাঠিয়েছেন, যদি আমি মনে করি, তাহলে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য যেন শোভনের সঙ্গে বসে কথা বলি। কিন্তু আমার প্রয়াত মা স্বর্গ থেকে নেমে এসে বললেও আমি রাজি নই। শোভনকে আদালতে দৌড় করাব, শেষ দেখে ছাড়ব।''

শোভন চট্টোপাধ্যায়

''বৈশাখী সম্পর্কে কোনও রকম আপত্তিকর কথা বলার আগে রত্না চট্টোপাধ্যায় নিজে আয়নার সামনে দাঁড়ান। তিনি কী করে বেড়িয়েছেন, সেটা ভাবুন। আমার অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হতে বসেছিল, তার মূলে রত্না। যেভাবে আমাকে অন্ধকারে রেখে সব কিছু চলেছে, সেটা জানার পর খাদের কিনারায় চলে গিয়েছিলাম। তখন বৈশাখী তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি ওই অবস্থা থেকে বার হতে পেরেছি। আজ আমি নিঃস্ব। বৈশাখীর সামাজিক সম্মান নিয়ে খেলার অধিকার রত্নাকে কেউ দেননি। তাছাড়া, রত্না দলের কথা বলে নিজের সীমারেখার বাইরে যাচ্ছেন।''

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

''রত্না চট্টোপাধ্যায়ের চাওয়া, না-চাওয়া দিয়ে শোভনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়নি। ওঁর চাওয়া, না-চাওয়ায় ভাঙবেও না। ব্যর্থতাজনিত হা-হুতাশ থেকে উনি আমার সম্পর্কে বিষোদ্‌গার করছেন। বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। তবে সহ্যের একটা সীমা থাকে! এবার আইনি ব্যবস্থা নেব। তৃণমূল আমার উপর ক্ষিপ্ত? তাহলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ থেকে রত্না অপসারিত হলেন কেন? শোভনকে উনি টাকা আর গয়নার আকর মনে করলেও সকলেই তো সেটা মনে করে না। পারিবারিক সূত্রে পাওয়ার জন্য ও শিক্ষকতার চাকরি করি বলে সে সবের অভাব আমার নেই। উনি নিজে কলুষিত সম্পর্কে লিপ্ত বলে আমার আর শোভনের সম্পর্ককে কলুষিত করতে চাইছেন।''

—সুন্দর মৌলিক

কৃষকদের দুঃখ মোচনে বিকল্প পন্থা প্রয়োজন

অতিথি কলম

প্রেরণা শর্মা সিংহ

চাষিদের কয়েক ডজন সংগঠিত সংস্থা হঠাৎ করে দেশের বড় বড় শহরে শাকসবজি, দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত নিল তা কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে চাষিদের মধ্যে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ক্রম ধূমায়িত ক্ষোভের প্রকাশ। তার চেয়েও বড় কথা এই সমস্যার নিরসনে সরকার চটজলদি সমাধান তো খুঁজে পাচ্ছেই না, একই সঙ্গে অতি উৎপাদনের ফলে কৃষিপণ্যের দামেও পতন দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামনের বছরে লোকসভা ভোটের আর খুব দেরি না থাকায় শাসকদল বেশি ঝুঁকি নিতে না পেরে চাষের যে খরচা কৃষকের তরফে হয়েছে তার ওপর শতকরা ৫০ শতাংশ বেশি খরচ চুকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত কতটা কাজে পরিণত হবে তা নিয়ে কিছুটা ধন্দ থেকেই যায়। আর এর মাধ্যমে অজস্র কৃষক পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তন কতটা সফল ভাবে করা যাবে সেটাও ভাবা দরকার। বিশেষ করে বাজারে কৃষিপণ্যের ক্রম হ্রসমান দামকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এটি কতদূর সফল হতে পারবে সেটাও বিচার্য। এছাড়া এই সিদ্ধান্তের এমন কিছু অনিচ্ছাকৃত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা যাতে কৃষিপণ্যের রপ্তানিক্ষেত্র মার খেতে পারে।

বাজারে গম, সরষে, বার্লি, মিলেট, কালো তিল প্রভৃতি পণ্যের উৎপাদন খরচের ওপর ৫০ শতাংশ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অনেকদিনই ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু তাতে যে কৃষকদের অসন্তোষ মেটেনি বা তা যে সঠিক কার্যকরী হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান কৃষক বিক্ষোভ ও মিছিল ইত্যাদিতে। এই সূত্রে কেন্দ্র ২৩টি কৃষি উৎপাদনের ক্রয়মূল্য বেঁধে দিলেও কেবলমাত্র ধান, গম ও আখের ক্ষেত্রে সরকার বা মিলগুলির ফলপ্রসূভাবে পণ্যটি কিনে নেওয়া বলবৎ আছে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে তা নেই।

তাই নিশ্চিতভাবেই আবার দামের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহের নিশ্চয়তা না দিতে পারলে বিষয়টা কতদূর কাজের হবে তা ভাবা দরকার। শুধু তাই নয়, যে পণ্যগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সঙ্গে তা কিনে নেওয়ার ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে চালু আছে সেখানেও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আসছে। এক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যেও যেমন— মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে পণ্য সংগ্রহের উন্নত পরিকাঠামো আছে। সংগ্রহের সময় বেশি পরিমাণ অপচয় ও বাইরে পড়ে যাওয়ার ফলে এখানেও সংগ্রহ খরচ বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত ভারতীয় কৃষক পরিবারের তিন চতুর্থাংশ বাজারে বিক্রি করবার মতো উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে পারে না। ফলে কী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক হলো তাতে তাদের খুব একটা হেরফের হয় না।

চতুর্থত, আখ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার খাতিরে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারগুলি নিজেদের জনপ্রিয়তার মানদণ্ড অটুট রাখতে সংগ্রহমূল্য অনেক সময় এতটাই বাড়িয়ে দিচ্ছে যে চিনির মিলগুলি বাস্তবে সেই দামে সংগ্রহের পর তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগকে প্রায় ধ্বংসের মুখে এনে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের চাষিদের দেয় বকেয়ার পাহাড় জমছে, অন্যদিকে উৎপাদিত চিনির দাম এখন তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। এর ফলে তারাও সরকারের কাছ থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলানোর আবেদন জানাচ্ছে। ভালো সমর্থন মূল্য নিশ্চিত করে দেওয়ার ফলে দেশে বেশি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় এমন সব শস্যের চাষ বেড়ে গেছে— যেমন ধান বা আখ। এমনকী যে সমস্ত অঞ্চলে জলের বড়সড় ঘাটতি রয়েছে যেমন হরিয়ানা, পঞ্জাব বা মহারাষ্ট্র সেখানকার বেশিরভাগ জল এই চাষই টেনে নিচ্ছে, ফলে অন্য চাষ মার খাচ্ছে। বলা দরকার, ধান ও আখ দেশের মাত্র ২৫ শতাংশ জমিতে চাষ হলেও তারা সেচযোগ্য মজুত জলের ৬০ শতাংশ টেনে নেয়। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মাত্র ১৮ শতাংশ জমিতে সেচ দেওয়ার উপযুক্ত জল থাকলেও আখ চাষে উৎসাহ থাকার ফলে সেখানেই মজুত ৭১ শতাংশ খরচ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন কৃষিপণ্য সমর্থন মূল্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার আনতে পারলে ভালো হয়। যেমন মধ্যপ্রদেশে পিডিপি (price deficiency payment) অর্থাৎ বাজার দামের সঙ্গে চাষির উৎপাদন মূল্যের যে ঘাটতি হচ্ছে তা মিটিয়ে দেওয়া চালু করেছে সয়াবিনের ক্ষেত্রে। হরিয়ানা করেছে ফল ফুলের ক্ষেত্রে। এগুলির কাজ কিছুটা ফলদায়ী হচ্ছে। উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজার দরের যে ফারাক হয় সরকার সেই ঘাটতি সরাসরি চাষির ব্যাঙ্ক খাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। মাঠে নেমে কোনও সংগ্রহ করছে না। এ সত্ত্বেও বাজার দর অনেক সময় এতটা নেমে যেতে থাকে তাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে সরকার এই প্রকল্পটি সাময়িকভাবে বাতিল করেছে। এর ফলে অনেকেই সন্দেহ করছেন অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়তো অনেক খরচসাপেক্ষ হওয়ার সঙ্গে যথেষ্ট

অপচয়েরও সম্ভাবনা থেকে যায়।

বাস্তবে সহায়ক মূল্যের মাধ্যমে দাম ঠিক করার ক্ষেত্রে বাজারে চাহিদার দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। উচ্চ সহায়ক মূল্যের আকর্ষণে বহু ক্ষেত্রেই উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপক বেড়ে গিয়ে বাড়তি সরবরাহ বাজারে এসে যায়। এর অনুষঙ্গ হিসেবে বাজারে পণ্যের দাম আরও পড়ে যায় ফলে অনুদানের মাত্রাও বাড়তে থাকে। চাল ও গমের ক্ষেত্রেই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুই ক্ষেত্রে সরকার উৎপাদনে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে আর তার পরেই যাতে বাজারে দাম না পড়ে যায় তার জন্য উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ সরকার নিজেই কিনে নিতে থাকে।

অন্যদিকে এম এস পি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটলে শস্যটির দামও স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পাবে এর ফলে বিশ্ব বাজারে ওই একই পণ্য যদি কম দামে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানির মার খাওয়ার আশঙ্কা। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যদি তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এর ফলে দেশের মধ্যে শস্যের সরবরাহ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাবে। সস্তায় আমদানিও শুরু হয়ে যেতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে সরকারকে হয় আমদানি শুল্ক বাড়াতে হবে, নয়তো রপ্তানি ক্ষেত্রে ভরতুকি দিয়ে মাল চালান করতে হবে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এর ফলে বিপন্ন চাষি যদি আবার ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ মকুব দাবি করে সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনাদায়ী ঋণের দায়ে কাবু ব্যাঙ্কগুলি বেজায় বেকায়দায় পড়ে যাবে।

সেই কারণে এটা মনে রাখা জরুরি, কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার কৃষিপণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে বা উৎপাদন খরচের ওপর ভরতুকি দিলেই যে সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা হলফ করে বলা যায় না। এক্ষেত্রে আর একটি কথা বলার যে যখন দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের দাম বেশি থাকে তখন

“কোনও বিশেষ কৃষিপণ্যকে চিহ্নিত না করে ঠিক তেলেঙ্গানায় যেমন করা হয়েছে সব ধরনের কৃষিজাত পণ্যকেই খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ দাম চাষিকে চুকিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে সরকার প্রতি হেক্টর চাষযোগ্য জমির কৃষককে সে যে শস্যই চাষ করুক না কেন ১০ হাজার টাকা এককালীন মিটিয়ে দিচ্ছে।”

কৃষিপণ্য উৎপাদকদের রপ্তানিতে বাধা দেওয়া অনেকটা তাদের শাস্তি দেওয়ারই শামিল। অন্যদিকে বাজারে দাম যখন পড়তির দিকে থাকে তখন আমদানি শুল্ক বাড়াবার ক্ষেত্রে সরকার অনেকটাই ধীরে চল নীতি নেয়। বাজারে মুদ্রাস্ফীতি না বাড়িয়ে কৃষকের আয় দীর্ঘমেয়াদি ভাবে বাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ আয়ের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটাতে কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ দরকার, যাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শস্য মাঠ থেকে উঠে গেলে তা সংরক্ষণের পরিকাঠামো নিশ্চিত করা। এর ফলে দেশব্যাপী কৃষিপণ্যের ২০ শতাংশ অপচয় বন্ধ হওয়া নিশ্চিত হবে।

এখন নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ কৃষিপণ্যকে চিহ্নিত না করে ঠিক তেলেঙ্গানায় যেমন করা হয়েছে সব ধরনের কৃষিজাত পণ্যকেই খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ দাম চাষিকে চুকিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে সরকার প্রতি হেক্টর চাষযোগ্য জমির কৃষককে সে যে শস্যই চাষ করুক না কেন ১০ হাজার টাকা এককালীন মিটিয়ে দিচ্ছে।

এই প্রকল্পের তুলনামূলক সহজ রূপায়ণযোগ্যতা ও বাজারের ওঠানামার ওপর সর্বদা নজর রাখার দরকার না থাকায় এই প্রকল্পকে দেশের অন্য রাজ্যেও অনুসরণ করা যেতে পারে। দামের ক্ষেত্রে রাজ্যওয়াড়ি কিছু হেরফের তো হতেই পারে। কৃষকরা এই প্রকল্পে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা কী শস্য বুনবে। তারা বাজারের চাহিদা, মূল্যমাণ আগে থেকেই আন্দাজ করে যে পণ্যের দাম ও চাহিদা ও লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকবে সেটিই চাষ করবে। সরকার তো হেক্টর হিসেবে এককালীন টাকার নিশ্চয়তা আগেভাগেই দিচ্ছে। তাই, ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি থেকে এখুনি বাইরে আনাই হবে মঙ্গলজনক। ■

রম্যরচনা

আমেরিকা একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। বুদ্ধি কমানোর যন্ত্র। এই যন্ত্রের ভিতর কাউকে ঢুকিয়ে যদি যন্ত্র চালু করে দেওয়া হয়— তাহলে তার বুদ্ধি ধীরে ধীরে কমে যাবে। যন্ত্র আবিষ্কারের পর চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। অনেকেই আসছে যন্ত্র দেখতে। কেউ কেউ বুদ্ধি কমাতেও চাইছে। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা এক একজনকে যন্ত্রের ভিতর ঢোকাচ্ছেন, আর বুদ্ধি কমাচ্ছেন। যার বুদ্ধি অল্প কমাতে হবে—তাকে পাঁচ মিনিট মেশিনের ভিতর রাখছেন। যার আর একটু বেশি কমাতে হবে—তাকে দশ মিনিট রাখছেন।

একদিন এক রাশভারি ভদ্রলোক এলেন। বললেন, আমাকে কুড়ি মিনিট মেশিনের ভিতর ঢুকিয়ে রেখে বুদ্ধি কমিয়ে দিন। বৈজ্ঞানিকরা রাজি হলেন। তাকে মেশিনের ভিতর ঢুকিয়ে মেশিন চালিয়ে দিলেন। মেশিন চালিয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিকরা গেলেন একটু চা খেতে। চা খেতে খেতে গল্পে বিভোর হয়ে কখন যে কুড়ি মিনিট চলে গেছে— তাদের খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হলো, তখন ঘড়িতে দেখলেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় পার। দৌড়তে দৌড়তে বৈজ্ঞানিকরা মেশিনের কাছে এলেন। দেখলেন, মেশিনে লাল আলো জ্বলছে। অর্থাৎ, ভিতরে যিনি আছেন, তার সব বুদ্ধি উবে গিয়েছে। তড়িঘড়ি করে বৈজ্ঞানিকরা মেশিনের পাল্লা খুললেন।

মেশিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন রাহুল গান্ধী।

উবাচ

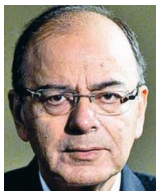

"আমার এক পূর্বসূরি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ হয়তো দারিদ্র্যে কাটবে। কারণ নোটবাতিল এবং জিএসটির জন্য জিডিপিতে ধস নামবে। কিন্তু তাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ডাহা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে।"

অরুণ জেটলি
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

চতুর্থ ত্রৈমাসিকে জিডিপির রেকর্ড বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

"বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি (মেমরেন্ডাম অব প্রসিডিয়োর) নিয়ে আমরা নিরন্তর আলোচনা করছি। সর্বোচ্চ আদালত এবং কেন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আমাদের বক্তব্য, যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম সব নথিপত্রে উল্লেখ করতে হবে।"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

বিচারপতি নিয়োগ প্রসঙ্গে

"তালিবান শাসনে হিন্দু এবং শিখেরা আফগানিস্তানে মারাত্মক অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিল। আমাদের চিহ্নিত করার জন্য হাতে হলুদ কাপড়ের টুকরো বেঁধে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল। ভাগ্য ভালো পরে তা বাতিল হয়।"

অবতার সিংহ খালসা
আফগানিস্তানের শিখ নেতা

আফগানিস্তানের নবনির্বাচিত পার্লামেন্টে হিন্দু ও শিখ সমাজের প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গে

"যদি আপনারা একে ধরনা বলতে চান তাহলে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অফিসের বাইরে গিয়ে ধরনায় বসুন। কারোর অফিসে বা বাড়ির ভেতর ঢুকে ধরনায় বসার অনুমতি আপনাদের কে দিয়েছে?"

এ.কে চাওলা
দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি

দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অফিসে আম আদমি পার্টির ধরনা প্রসঙ্গে

মিথ্যা, মিথ্যা, শুধুই মিথ্যা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় সরকার এবং সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে যে অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তুলেছেন খ্রিস্টান মিশনারিরা, তার কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন, খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্থানের ওপর হামলা। কিন্তু তাঁদের এই অভিযোগ কতখানি সত্য? সত্যিই কি সঙ্ঘ পরিবার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কালিমালিপ্ত করতেই মিথ্যার বেসাতি করা হচ্ছে?

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হচ্ছে, ততই দেশের অভ্যন্তরে ভারত-বিরোধী শক্তিগুলি আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। এদের একটিই লক্ষ্য— যে কোনও উপায়ে ২০১৯-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসন আবার নেহরু-গান্ধী পরিবারের হাতেই সমর্পণ করা। অন্য কোনওভাবেই যখন নরেন্দ্র মোদীর মোকাবিলা করা যাচ্ছে না— তখন একটি অস্ত্রই এরা বেছে নিয়েছে। তা হলো— নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার এবং বিরামহীন মিথ্যা প্রচার। মিথ্যার পাহাড় গড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। যে ভারত বিরোধী শক্তিগুলি নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে— তার ভিতর রয়েছে ভ্যাটিক্যানের আশীর্বাদধন্য খ্রিস্টান মিশনারিরাও। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই এই খ্রিস্টান মিশনারিরা বাজার গরম করতে আসরে নেমে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই দিল্লি এবং গোয়া— এই দুই জায়গার আর্চবিশপরা অভিযোগ করেছেন, এই সরকারের আমলে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়। আসন্ন নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের আবেদনও এই খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা জানিয়ে রেখেছেন।

> ডলার এবং পাউন্ডের লোভ দেখিয়ে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসা ধর্মান্তরকরণের কারবারটি যাতে নিশ্চিন্তে ভারতের মাটিতে চালিয়ে যাওয়া যায়— তার জন্যই নরেন্দ্র মোদী নামক ব্যক্তিটিকে তাদের সরাতে হবে। নিয়ে আসতে হবে ভ্যাটিক্যানের আশীর্বাদধন্য কোনও ব্যক্তিকে।

তবে, এই প্রথম যে এঁরা এ কাজ করলেন— এমন কিন্তু নয়। বরং, দেখা যাচ্ছে, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পরিকল্পিত ভাবে এই খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সরকার সম্বন্ধে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করতে বাজারে নেমেছে। ২০১৫ সালে মাদ্রাজ-মাইলাপোরের আর্চবিশপ জর্জ অ্যান্টনি স্বামী বলেছিলেন— 'এদেশে সংখ্যালঘুরা ভয়ানক বিপদের ভিতর দিন কাটাচ্ছে। কেননা তাদের ধর্মীয় স্থানগুলির ওপর হামলা হচ্ছে।' ওই বছরই বেঙ্গালুরুর আর্চবিশপ বার্নার্ড মোরাস বলেছিলেন, 'যে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি চার্চের ওপর হামলা চালাচ্ছে— তাদের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের মদত রয়েছে।' ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরামের মুখপাত্র জন দয়াল ওই বছর বলেছিলেন— 'খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের ওপর হামলার পিছনে রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। নরেন্দ্র মোদী সঙ্ঘ পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছেন না।'

কেন্দ্রীয় সরকার এবং সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে যে অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তুলেছেন খ্রিস্টান মিশনারিরা, তার কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন, খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্থানের ওপর হামলা। কিন্তু তাঁদের এই অভিযোগ কতখানি সত্য? সত্যিই কি সঙ্ঘ পরিবার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কালিমালিপ্ত করতেই মিথ্যার বেসাতি করা হচ্ছে? ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই দিল্লির কয়েকটি চার্চে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সংবাদমাধ্যমগুলি এইসব ঘটনার জন্য সঙ্ঘ পরিবারকেই দায়ী করে। ২০১৫ সালে দিল্লির দিলশাদ গার্ডেন এলাকায় সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চে আগুন লাগে। এই ঘটনাতেই প্রথম সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। দিল্লির আর্চবিশপ অনিল কুটো প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়ে এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তও দাবি করেন। কিন্তু পরে ফরেন্সিক তদন্তে জানা যায়, কোনও বহিরাগত ওই চার্চে আগুন লাগায়নি। চার্চের ঘরে প্রচুর পরিমাণে মোমবাতি মজুত ছিল। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত সেখান থেকেই। দিল্লির বিকাশপুরিতে লেডি অব গ্রেস চার্চের ঘটনাতেও সঙ্ঘ পরিবারকে কাঠগড়ায় তোলা হয়। ওই চার্চে দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হামলা চালানোর পরে এই হামলার পিছনে 'রাজনৈতিক কারণ' আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তদন্তে প্রমাণ হয়— যে দুই ব্যক্তি চার্চে হামলা চালিয়েছিল—তাদের সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবারের কোনও সম্পর্কই ছিল না। চার্চের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত রেষারেষিতেই ওই ঘটনা ঘটে। পরে অবশ্য দিল্লির ক্যাথলিক আর্চডায়োসেসের মুখপাত্র শভরিমুথুশঙ্কর স্বীকার করেছিলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হেয় করতেই কেউ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করেছিল। দিল্লির বসন্তকুঞ্জের সেন্ট আলফোনসা চার্চেও কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ঢুকে চার্চের

কিছু দামি জিনিসপত্র নষ্ট করে এবং চুরি করে। এক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পরে দেখা যায় একাজ নিছকই কিছু সমাজবিরোধী করেছিল। ঠিক তেমনই, দিল্লির সাইনো মালাবার চার্চ জসোলায় ইঁট ছোঁড়ার ঘটনায় সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরে তদন্তে প্রকাশ হয়েছে, স্থানীয় ছেলেরা খেলার সময় পরস্পরকে লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে থাকলে, সেই ইঁটই গিয়ে লাগে চার্চে। দিল্লির চার্চ অব রেজারেকশনে আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করা হয় ষড়যন্ত্র করেই আগুন লাগানো হয়েছে। দমকল এবং ফরেনসিক বাহিনীর তদন্তে প্রকাশ পায়, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ ছিল না।

এখন প্রশ্ন হলো, দিল্লির এই চার্চগুলিকে কেন্দ্র করে এমন মিথ্যা প্রচার করা হলো কেন? কেন সঙ্ঘ পরিবারকে কাঠগড়ায় তুলে দিল্লির মানুষের মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলো? এই ঘটনাগুলি যখন ঘটে তার কিছুদিন পরেই দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন ছিল। দিল্লি বিধানসভায় বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। ওই বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি জিতে আসার পর খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা যেসব বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে পরিকল্পিত ভাবেই সঙ্ঘ পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল। দিল্লির আর্চবিশপ অনিল জোসেফ টমাস কুটো এক বিবৃতিতে বলেছিলেন— 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেতায় আমরা খুশি। এই নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদীদের প্রত্যাখ্যান করেছেন দিল্লির মানুষ।' কিন্তু এরপর যখন তদন্তে উঠে আসে, একটি ঘটনার জন্যও সঙ্ঘ পরিবার দায়ী নয়, বরং এইসব ঘটনায় মিথ্যা সাম্প্রদায়িক রং চড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তখন দিল্লির আর্চবিশপের সুর কিন্তু একদম পাল্টে যায়। তখন তিনি বলেন, 'আমি তো কোনও রাজনৈতিক দল অথবা কোনও বিশেষ সংগঠনের নাম করিনি। যা করার সংবাদমাধ্যম করেছে। তারাই বিশেষ সংগঠনের নাম করেছে। পুলিশ সত্য অনুসন্ধান করে দোষীদের ধরুক।' দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের দুদিন আগে দিল্লিতে সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে খ্রিস্টান মিশনারিরা একটি মিছিল বের করে। সেই মিছিলে সক্রিয়ভাবে আম আদমি পার্টির সমর্থক এবং অতি বামপন্থীদের অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল। এরপর বুঝতে অসুবিধা হয় কি— ষড়যন্ত্রের স্বরূপটি কী?

শুধু যে দিল্লির ক্ষেত্রেই খ্রিস্টান মিশনারিরা এরকম মিথ্যা রটনা করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছেন, তা নয়। হরিয়ানার হিসারে নির্মীয়মাণ বিলিভারস চার্চে ভাঙচুরের ঘটনাতেও সঙ্ঘ পরিবারের নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তদন্তে জানা যায়, ওই চার্চের বিশপ সুভাষ স্থানীয় মানুষদের ঘুষ দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। এমনকী অর্থের বিনিময়ে তাদের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙতেও বলেন তিনি। ওতেই স্থানীয় গ্রামবাসীরা খেপে গিয়ে ওই নির্মীয়মাণ চার্চটি ভাঙচুর করে। তেমনই রানাঘাটে এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীর ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনাতেও তদন্তের আগেই সঙ্ঘ পরিবারের দিকে আঙুল তোলা হয়েছিল। ভ্যাটিক্যানের এক প্রতিনিধি দলও ছুটে এসেছিল রানাঘাটে। পরে পুলিশি তদন্তে প্রকাশ পেল, বাংলাদেশ থেকে আসা একাধিক মুসলমান দুষ্কৃতী ওই সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ করেছিল। বেঙ্গালুরুতে কিছু মাদকাসক্ত ব্যক্তি, যাদের ভিতর আবার কয়েকজন খ্রিস্টানও ছিল, সেন্ট অ্যান্টনিস চার্চে হামলা চালানোর পর তার দায়ও প্রথমে হিন্দুত্ববাদীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলেছিল। তেমনই মুম্বাইয়ের সেন্ট জর্জেস ক্যাথলিক চার্চ, আগ্রার সেন্ট মেরিজ চার্চ—এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে--- একটির পিছনেও সঙ্ঘ পরিবারের কোনও যোগ ছিল না। বরং, সবকটি ঘটনাতেই চার্চের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংঘর্ষ থেকেই এইসব ঘটনা ঘটেছে। অনেক ঘটনাতেই দেখা গেছে, চার্চ নিজেই ইন্ধন জুগিয়েছে এইসব ঘটনায়। যেমন, মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ার ঘটনা। ঝাবুয়ার খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত একটি আশ্রমে তিনজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী দুষ্কৃতীদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। ঘটনাটি ঘটে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে। সেই সময়ও সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। বিদেশ থেকে বিভিন্ন খ্রিস্টান সংগঠনের সদস্যরাও ছুটে আসেন ঝাবুয়ায়। পরে এই ঘটনার জড়িত থাকার জন্য যাদের গ্রেপ্তার করা হয়, দেখা যায় তাদের ভিতর ১২ জনই খ্রিস্টান। ঘটনাটি ঘটেছিল ওই আশ্রমেরই অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের ফলস্বরূপ।

এই ঘটনাগুলি পরিষ্কার করে দেয় ষড়যন্ত্রের স্বরূপটি। বোঝাই যায়, আর্চবিশপরা কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে অসহিষ্ণুতার গল্প ছড়াচ্ছেন বাজারে। আর এই অসহিষ্ণুতার গল্প ছড়াতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন এঁরা।

কিন্তু অসহিষ্ণুতার ইতিহাস ঘাঁটতে বসলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে খ্রিস্টান মিশনারিদেরই। ইতিহাস চর্চা করলে আমরা দেখতে পাব— নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়ার খ্রিস্টানরা এদেশে এসে গোয়ায় বসতি স্থাপন করে। স্থানীয় হিন্দুরা এদের উপাসনা এবং জীবনযাপনের সমস্ত সুবিধা প্রদান করে। কিন্তু পর্তুগিজরা যখন পঞ্চদশ শতকে ভারতে প্রবেশ করল, অশান্তি শুরু হলো তখনই। ১৫৪১-৪২ সালে ফ্রান্সিস জেভিয়ার গোয়ায় পৌঁছে দেখেন, সেখানে আশ্রয়প্রাপ্ত সিরিয়ার খ্রিস্টানরা অ-খ্রিস্টানদের মতো আচরণ এবং পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করছে। খ্রিস্টধর্মের প্রতিও তারা খুব একটা অনুরক্ত নয়। জেভিয়ার তখন পর্তুগালের শাসক কিং জন তৃতীয়কে পত্র লিখে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের অনুরোধ জানান। পর্তুগালের রাজার সম্মতি লাভের পর জেভিয়ারের নেতৃত্বে গোয়ায় হিন্দুদের ওপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার। হাজার হাজার হিন্দুর জিভ কেটে এবং গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে তাদের হত্যা করা হয়। হিন্দুদের সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এই অত্যাচারী হিন্দু ঘাতক খ্রিস্টান মিশনারিকে ১৯৬২ সালে ভ্যাটিক্যান সন্ত হিসাবে ঘোষণা করেছিল। নরঘাতক জেভিয়ার হয়ে গিয়েছেন 'সেন্ট জেভিয়ার।'

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের মিথ্যার কারবার আরও ফলাও করে ফেঁদে বসবেন। ডলার এবং পাউন্ডের লোভ দেখিয়ে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসা ধর্মান্তরকরণের কারবারটি যাতে নিশ্চিন্তে ভারতের মাটিতে চালিয়ে যাওয়া যায়--- তার জন্যই নরেন্দ্র মোদী নামক ব্যক্তিটিকে তাদের সরাতে হবে। নিয়ে আসতে হবে ভ্যাটিক্যানের আশীর্বাদধন্য কোনও ব্যক্তিকে। যিনি ভারতের প্রতি নয়, অনুগত হবেন ইতালির প্রতি। টমাস কুটোরা এখন এই খেলাই খেলতে নেমেছেন। ■

খ্রিস্টান জঙ্গিবাদের পথে বাধা মোদী তাই ক্ষিপ্ত ভ্যাটিক্যান

চার্চ হচ্ছে চতুর্থ বাহিনী ও জনমানসে মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব ফেলার উপায়। এর জন্য অর্থের দরকার। তাই এনজিও খোলো, বিদেশ থেকে অর্থ আনো, ভারতবিরোধী কাজে লাগাও। আই-টি রিটার্ন চাইলেই মোদীর ওপর গোঁসা। মোদী সরকার উৎখাত করতে প্রচার চালাও।

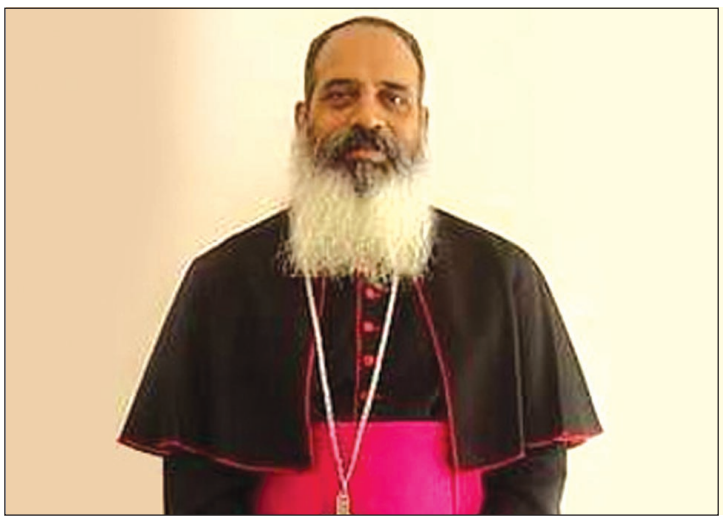

গান্ধীনগরের পাদ্রি টমাস ম্যাকওয়ান।

নীতীন রায়

দিল্লির আর্চবিশপ মোদী সরকারকে উৎখাত করার প্রার্থনা ক্যাম্পেন করার কথা বলেছেন। তিনি নিজে দিল্লির চার্চে প্রার্থনা করেছেন এবং ১৩ মে চার্চে চার্চে প্রার্থনা ক্যাম্পেন চালিয়ে মোদী সরকারের পতন ঘটানোর আহ্বান জানিয়েছেন। গুজরাট নির্বাচনের সময় গান্ধীনগরের আর্চবিশপ বিজেপি সরকারকে পরাজিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের এইরূপ আচরণ কেন? একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি, অন্যদিকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের গভীর প্রেক্ষাপটের এক ইতিহাস আছে।

ভ্যাটিক্যান সিটি সর্বজনগ্রাহ্য স্বাধীন রাষ্ট্র। তার বেতনভোগী কর্মচারী হচ্ছে বিশপ কার্ডিন্যাল ও আর্চবিশপরা। তাই তাদের আনুগত্য পোপের প্রতি সমর্পিত। সেমেটিক ধর্মগুলোতে আধ্যাত্মিকতা নেই। হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এদের মেলালে বড়ো ভুল হয়ে যাবে। ক্রিশ্চিয়ানিটির জন্ম হয় যিশুর মৃত্যুর ১৫০ বছর পর। যিশু মিশরের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পরম্পরায় তিনি ১৬/১৭ বৎসর বয়সে ভারতে চলে আসেন। লাদাখে বৌদ্ধ লামাদের কাছে তার উপস্থিতির কথা লিপিবদ্ধ আছে। একজন রাশিয়ান পর্যটক, পরে অভেদানন্দ ভারতে তার উপস্থিতি নিয়ে বই লেখেন। যিশু বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ম্যাগডালেন। দ্য ভিঞ্চির 'The last Supper' ছবিটির ডান পাশে বসা মহিলাই তাঁর স্ত্রী। হলিউডের বিখ্যাত ছবি 'দ্য ভিঞ্চি কোড' তৈরি হয় যিশুর বিবাহিত জীবন ও তার সন্ততিদের নিয়ে। ভ্যাটিক্যান সিটি এই কথা গোপন রেখেছে।

ক্যাথলিক চার্চগুলো বিজ্ঞান ও ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশানে বিশ্বাস করে না। গ্যালিলিও কোপারনিকাসের হত্যা এবং পাশ্চাত্যের বহু লেখকের পুস্তক এর প্রমাণ। শেক্সপিয়র ও সমারসেট মমের বই নিষিদ্ধ তালিকায় ছিল। মধ্যযুগে চার্চের ইনকুইজিশনের নামে অত্যাচার পৃথিবী ভোলেনি। বর্তমান পোপ কার্ডিন্যাল জোসেফ রায়জিভার ১৬২ তম পোপ, জাতিতে জার্মান। যুদ্ধের প্রবণতা তার রক্তে।

পোপ আরাবান ১০৯৫ সালে প্রথম ক্রুসেডের মাধ্যমে ইসলামের বাড়বাড়ন্ত ঠেকিয়ে জেরুজালেম পুনর্দখল করেন। ১১৪৭ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেডে ভ্যাটিক্যান কোনো সফলতা পায়নি। তৃতীয় ক্রুসেড ১১৮৭ সালে। বর্তমান পোপ ২০০৫ সালে নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে জার্মানির ভূমিতে দাঁড়িয়ে চতুর্থ ক্রুসেডের কথা উচ্চারণ করেন।

১৯৭৮ সালে পোপ জন পল-১ রহস্যজনক ভাবে মারা যান। আমেরিকা তখন অ্যান্টি কমিউনিস্ট পোপ চাইছিল। রোমে সিআইএ এজেন্ট লিসিলিও সমস্ত কার্ডিনালের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করে দ্বিতীয় জন পলকে নির্বাচিত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে দ্বিতীয় জন পলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমেরিকা ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ১৮৮৪ এবং ১৯৫০ সালে আমেরিকাকে খ্রিস্টান দেশ হিসেবে ঘোষণার চেষ্টা হয় কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে সরকারি নীতি হলো ক্রিশ্চিয়ানিটিকে সাহায্য করা। চার্চকে সম্পত্তি কর দিতে হয় না। দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টান ধর্মীয় স্কুলগুলো সাবসিডি পায়। আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা আমেরিকাকে খ্রিস্টান দেশ মনে করে। কিছু রায়ের কথা উল্লেখ করলে বিচার বিভাগের মানসিকতার প্রতিফলন বোঝা যাবে :

সুপ্রিম কোর্ট (১৮৩৯) ভিদাল বনাম জিরাট্ট এক্সিকিউটার আমেরিকা একটি খ্রিস্টান দেশ ইউ এস বনাম মেকিনটাস (১৯৩১) আমেরিকা খ্রিস্টানদের দ্বারা পূর্ণ।

সুপ্রিম কোর্ট হোলিট্রিনিটি বনাম ইউ এস স্টেটস কেসে বিচারক ব্রুওয়ার বলেন, আমেরিকা খ্রিস্টান নেশান। বিভিন্ন সময়ে

প্রেসিডেন্টরা আমেরিকার খ্রিস্টান চরিত্রের কথা বলেছেন। উইড্রো উইলসন বলেছিলেন, ''আমেরিকা জন্ম থেকেই খ্রিস্টান রাষ্ট্র।'' হ্যারি ট্রুম্যানের মতে আমেরিকান একটি খ্রিস্টান জাতি। রিচার্ড নিক্সনের মতে 'আমরা একথা স্মরণে রাখবো আমরা খ্রিস্টান জাতি, তাই আমাদের একটি দায়িত্ব ও লক্ষ্য আছে।' আমেরিকা ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে খ্রিস্টান স্বার্থের ধারক ও বাহক এবং সেখানে সংখ্যাগুরু রাজনীতি হয়। অপরপক্ষে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। হিন্দুপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও ভারতে কোনও প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি কোনোদিন বলেননি ভারতবর্ষ একটি হিন্দু রাষ্ট্র। এখানে সংখ্যালঘু রাজনীতি হওয়ার ফলে হিন্দুরা বরং নানা দিকে বঞ্চিত। মিজোরামের রিয়াং হিন্দুরা ৪০ বছর ধরে নির্যাতিত এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতরা স্বদেশেই উদ্বাস্তু। তা সত্ত্বেও মিডিয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। তাই দিল্লির আর্চবিশপ কেন মোদীকে উৎখাতের কথা বললেন তা সহজেই অনুমেয়।

চার্চগুলোর অপকর্ম

ভ্যাটিক্যান সিটির বিশপ, আর্চবিশপ ও কার্ডিনালরা তাদের সহকর্মী ও নানদের যৌন উৎপীড়ন করে। রোমের দৈনিক পত্রিকা 'লা রিপাবলিকা' ভ্যাটিকান সিটির যৌন উৎপীড়নের উপর গোপন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ২৩ দেশের মধ্যে আমেরিকা ফিলিপাইন সহ ভারতবর্ষের নাম রয়েছে। 'লা রিপাবলিকা' এক কার্ডিনালের ২৯ জন নানকে প্রেগন্যান্ট করার কথা বলেছে, সঙ্গে রয়েছে সমকামিতা। ভারতবর্ষেও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।

সিস্টার অভয়া ২৩ বৎসর বয়সি নান। কেরলের কোন্টামের কনভেন্টে থাকতেন। তাকে এক বিশপ যৌন উৎপীড়ন করে হত্যা করে। চার্চ আর এস এস-এর নাম জড়িয়ে প্রচার শুরু করে। তারপর তদন্ত দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা হয়।

২০১১ সালে ঝাড়খণ্ডের চ্যারিটি অব জেসাম-এর সদস্য সিস্টার ভালসা জন ধর্ষিতা হয়ে নিহত হন। এখানেও আর এস এস-কে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়। তদন্তে খ্রিস্টানদের নাম উঠে আসে। পশ্চিমবাংলার রানাঘাটের বৃদ্ধা নান বাংলাদেশি ডাকাতদের হাতে ধর্ষিতা হন। পরে ডাকাতরা ধরা পড়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্চ মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচার চালাচ্ছে।

২০১২ সালে দুজন ইতালিয় নাবিক ভারতীয় জেলেদের গুলি করে মারে। ফাইড এজেন্সি, যা ভ্যাটিক্যান নিউজ হিসেবে পরিচিত, জানায়, কার্ডিনাল খারানমার জর্জ এলেন বেরি ক্যথলিক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ইতালীয় নাগরিকদের হয়ে দরবার করেন।

তামিলনাড়ুর কন্দকোনম জেলায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার রি অ্যাক্টর স্থাপনার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারিরা আন্দোলন চালায়। ইউপিএ সরকার তখন ৫টি খ্রিস্টান সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৭ অক্টোবর ১৯৯৩ সালে দ্য সানডে স্টেটসম্যান জানায়, এনএলএফটি ত্রিপুরায় আগ্নেয়াস্ত্র এনে জোর করে হিন্দু জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করেছে। তাদের সামনেই বিভিন্ন দেবমূর্তি ভেঙে যিশুর মূর্তির কাছে প্রার্থনা করতে আদেশ করে। এই এনএলএফটি পুরো পূর্ব ভারতে মিশনারিদের হ্যান্ডস হিসেবে হিন্দুদের হত্যা করেছে। তাদের অস্ত্র ও অর্থ জুগিয়েছে কার্ডিন্যালরা। মোদী জমানায় ভারতীয় সেনা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়। মায়নামারে ঢুকে তাদের ক্যাম্প গুড়িয়ে দেয়।

মিজোরামে ৩০ হাজার রিয়াং হিন্দুকে উৎখাত করে চার্চসমর্থিত মিশনারিরা। তারা ৩০ বছর ধরে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরার তাঁবুতে জীবন কাটাচ্ছে।

চার্চগুলোর উদ্দেশ্য কী

ধর্মে খ্রিস্টান গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ ড. জেমি কুমারাপ্পা বলেছেন, পাশ্চাত্যের চারটি বাহিনী আছে। পদাতিক, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী এবং চার্চ। যোসেফ স্ট্যালিন চার্চকে অদৃশ্য সেনা বলেছেন। 'ন্যায় ও শান্তি কমিশনের' প্রধান মিঃ জন ফস্টার বলেন, বিশ্বের চার্চগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ১৯৪৫ সালে ওই কমিশন ঘোষণা করেছিল, 'এখন যুদ্ধ শেষ। সারা বিশ্বে চার্চগুলোকে আরও উন্নত হতে হবে। যে সমস্ত দেশে খ্রিস্টান শক্তি কম সেই সমস্ত দেশগুলিতে খ্রিস্টানরা অতি দ্রুত সুসংবদ্ধ এবং সংগ্রামী সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।'

১৯৪৮ সালে আমস্টারডামে বিশ্ব চার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬১, ১৯৬৮ সালের সম্মেলনগুলিতে যে নীতি নিতে চার্চগুলোকে বলা হয় তা হলো—

(১) খ্রিস্টানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হোক। (২) এশিয়ার চার্চগুলোকে বলা হোক সংঘর্ষ বাঁধিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা নিতে। (৩) পূর্ব এশিয়ায় দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, গ্রামীণ কৃষক, শহরাঞ্চলের মেহনতী মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য খ্রিস্টানদের নির্দেশ দেওয়া হোক। (৪) লুটপাট, দাঙ্গা হাঙ্গামার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে বলা হোক।

(তথ্যসূত্র : ড. হকিং 'রিথিঙ্কিং অব মিশন ক্রিশ্চিয়ানিটি' এবং এশিয়ান রেভলিউনিশন' বাই বিশ্ব খ্রিস্টান কাউন্সিল।

সারা ভারতে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ২.৩ শতাংশ

বিভিন্ন রাজ্যে খ্রিস্টান সংখ্যা হলো :

সিকিম ৬.৭ শতাংশ, অরুণাচল ১৮.৭ শতাংশ, নাগাল্যান্ড ৯০ শতাংশ, মণিপুর ৩৪ শতাংশ, মিজোরাম ৮৭ শতাংশ, ত্রিপুরা ৩.২ শতাংশ, মেঘালয় ৭০.৩ শতাংশ, অসম ৩.৭ শতাংশ, ঝাড়খণ্ড ৪.১ শতাংশ, গোয়া ২৬.৭ শতাংশ, কেরল ১৯ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৬.১ শতাংশ, পণ্ডিচেরী ৬.৯ শতাংশ, আন্দামান -নিকোবর ২১.৭ শতাংশ।

পূর্বাঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে এবং খ্রিস্টান ও মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে। এই বৃদ্ধি চার্চগুলোকে জঙ্গি বাহিনী তৈরি করতে উৎসাহিত করেছে। রাজীব-লালথানহাওলা চুক্তি অনুযায়ী মিজোরাম খ্রিস্টান স্টেট। রাজ্যধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম। মিজোরামে যেতে অন্য ভারতীয়দের পারমিট দরকার। চার্চগুলো প্রশাসন চালায়। হিন্দুর ট্যাক্সের টাকায় খ্রিস্টানিটির কাজ চলে। তারপরও চার্চের কর্মচারীরা মোদী সরকার উৎখাত করতে বলে?

পাশ্চাত্যের এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে চার্চ। চার্চ হচ্ছে চতুর্থ বাহিনী ও জনমানসে মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব ফেলার উপায়। এর জন্য অর্থের দরকার। তাই এনজিও খোলো, বিদেশ থেকে অর্থ আনো। নেতা ও মিডিয়াকে দাও খ্রিস্টান তৈরি করে। বিদ্রোহ করো, দাঙ্গা লাগাও। সবকিছুতে বাধ সেধেছে হিন্দুত্বের জাগরণ। ৫৭ হাজার এনজিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। IT Return দাখিল না করার জন্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মুখোশ খুলে গেছে তাই চার্চ কাঁদুনি গাইতে ব্যস্ত

বলবীর পুঞ্জ

প্রথমে দিল্লির প্রধান পাদরি অনিল কুটো এবং তারপর গোয়ার আর্চ বিশপ ফিলিপ নেরি ফেরাও ভারতের খ্রিস্টান সমাজের প্রতি যে পত্র লিখেছেন তা খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। চিঠির বিষয়বস্তু হলো 'দেশের বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র ও সংবিধান সঙ্কটগ্রস্ত। তথাকথিত অবহেলিত সমাজ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নিরন্তর বেড়ে চলেছে।' তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চার্চ কি স্বয়ং নিজেকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের রক্ষক মনে করছে? প্রকৃতপক্ষে গত চার বছরে এমন কী ঘটেছে বা বর্তমানে কী ঘটছে যে চার্চ এত বিচলিত হয়ে পড়েছে। পিছনে এমন কোনও খেলা নেই তো যা এরকম শ্রুতিমধুর বাক্য দিয়ে আড়াল করা হচ্ছে? ২০১৮-র শুরুতে পুনার ভীমা-কোরেগাঁওয়ে জাতপাতের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। তদন্তে তার পিছনে দেশবিরোধী শক্তির উস্কানি প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমে এই গণ্ডগোলের জন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোকেই দায়ী করা হয়েছিল। পরে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস হয়েছে। এখন তদন্তে পরিষ্কার জানা গিয়েছে যে, নকশালরাই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই হিংসা ছড়িয়েছে এবং তারাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে।

যে কোনও সার্বভৌম দেশে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধঘটিত বিষয় সামনে আসে, ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে কোনও অপরাধজনিত ঘটনা অবহেলিত সমাজের লোক, খ্রিস্টান বা মুসলমান পীড়িত হলে তৎক্ষণাৎ তার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তা সত্ত্বেও লোকসভা ভোটের আগে এক ব্যক্তি ও বিশেষ এক দলকে খেয়াল রেখে চার্চ

পাদরি অনিল কুটো

কেন সক্রিয় হয়ে পড়েছে? এদের পিছনে কে রয়েছে? ভারতে প্রধান পাদরিকে নিয়োগ করেন পোপ এবং তাঁকে কেবল ভ্যাটিক্যান সিটিকেই জবাবদিহি করতে হয়। ইতালির রোমস্থিত ভ্যাটিক্যান নিজেকে সার্বভৌম ও স্বাধীন সত্তা মনে করে। ক্যাথলিক চার্চের ঘোষিত অ্যাজেন্ডা হলো--- যেমন ভাবে প্রথম সহস্রাব্দীতে ইউরোপ, দ্বিতীয়তে আমেরিকা-আফ্রিকাকে খ্রিস্টান করা হয়েছিল সেরকম ভাবে তৃতীয় সহস্রাব্দীতে এশিয়া ভূখণ্ডে খ্রিস্টের জয়পতাকা উড্ডীন করতে হবে।' এই পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়া ভূখণ্ডে খ্রিস্টানদের স্থিতি হলো— ঔপনিবেশিক কাল থেকে চার্চ ভারতে যেমন সুযোগসুবিধা ভোগ করছে, সেরকম কি চীন, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভোগ করে? সেখানে তো খ্রিস্টান-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক! চার্চের বর্তমান উষ্মা তৃতীয় সহস্রাব্দীতে তাদের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় তো? ভারতের কালজয়ী সনাতন পরম্পরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ভয়, লোভ ও ছলের শিকার হয়েছে। চিন্তার এই দৈন্যের বিষয়ে গান্ধীজী তাঁর জীবনকালে বহুবার লিখেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খ্রিস্টান মিশনারি ও চার্চের অনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভবানীশঙ্কর নিয়োগীর সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠন করে। তাতে আইন করে ধর্মান্তরণ বন্ধ করার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে কমিশন। পাদরি তাঁর চিঠিতে ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের দোহাই দিয়ে ভারতের সংবিধান বিপদের মধ্যে পড়েছে বলে লিখেছেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এবং ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে 'সেকুলার' শব্দ যুক্ত করার আগে ভারত কি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না? ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতা তার কালজয়ী সনাতন সংস্কৃতি এবং বহুত্ববাদী দর্শনের কারণেই। সেজন্যই ভারত 'একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'-র প্রেরণা দিয়েছে এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— সারা বিশ্ব এক পরিবার মনে করে।

আজ চার্চের নিরাপত্তা ও বিপদের অনুভূতি হওয়ার কারণ হলো তাদের বিদেশি ফান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া। ২০১৪ সালের আগে তাদের ও তাদের সমর্থক এনজিওগুলি খুব সহজেই এই বিদেশি ফান্ড পেয়ে যেত। এই বিপুল অর্থ তারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে খরচ করত। মোদী সরকার বিদেশি ফান্ড অধিনিয়মের উল্লঙ্ঘনকারী ১৮ হাজার ৮৬৮টি এনজিও-র রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দিয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এনজিওগুলির বিদেশি ফান্ড ৬,৪৯৯ কোটি টাকা। কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। ওই এনজিওগুলির কালো চেহারা মাঝেমধ্যে সামনে আসে। দাভোসে অনুষ্ঠিত ইকনমিক সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিটিশ এনজিও অক্সফার্মের ঘোষিত অ্যাজেন্ডা ও তাদের আর্থিক অনিয়মের কথা প্রমাণ-সহ প্রকাশ্যে এনেছেন। প্রায় সেই সময়েই অক্সফার্মের পদাধিকারীদের ভূমিকম্প পীড়িত হেয়তিতে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে হাউস অব কমন্স হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছে।

আজ ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি যদি কারো দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তা নকশালবাদ, ইসলামি কট্টরবাদ, দেশবিরোধী শক্তিকে পুষ্টকারী তথাকথিত পরিবেশবিদ এবং দীন বিচারধারার তথাকথিত স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। এদের টিকি ভারতের বাইরে বাঁধা রয়েছে। এরাই চার্চের শক্তি। এদের গায়ে হাত পড়াতেই চার্চের এই আপত্তি।

(লেখক প্রবীণ স্তম্ভলেখক এবং রাজ্যসভার পূর্বতন সদস্য)

বাংলাদেশের জামালপুরের সোয়া তিনশো বছরের ঐতিহাসিক দুই মন্দির— দয়াময়ী মন্দির ও রাধামোহন জিউ মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণের অজুহাতে গ্রাস করতে চায় বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশে দেবোত্তর ভূমি গ্রাস করার উদ্যোগ সমানে চলছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ রাজধানী ঢাকায় ঐতিহাসিক রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমের দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাস করে স্বাধীনতা প্রকল্প করার পর এবার সরকার হাত বাড়িয়েছে জামালপুরের সোয়া তিনশো বছরের ঐতিহাসিক দুই মন্দির— দয়াময়ী মন্দির ও রাধামোহন জিউ মন্দিরের দেবোত্তর ভূমির দিকে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা প্রশাসন এই দুই মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি অধিগ্রহণ করে সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিরায়ত স্থাপত্যকলার নিদর্শন এই দুই মন্দির জাগ্রত দেবস্থলী হিসেবে এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করলেও এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়তে যাচ্ছে। এ নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

দিনাজপুরের ইতিহাসখ্যাত কান্তজীর মন্দির ও পাবনার জোড় বাংলা মন্দিরের মতোই দয়াময়ী মন্দির ও রাধামোহন জিউ মন্দির সমগ্র উপমহাদেশে খ্যাত। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে ১১০৪ বঙ্গাব্দে এই দুই মন্দির নির্মিত হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই গুঁড়িয়ে দিতে সারাদেশে ধ্বংসলীলা চালায়। তাদের হামলা থেকে এই দুই মন্দিরও রক্ষা পায়নি। ফলে ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও, ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এই দুই মন্দিরে পূজার্চনা বন্ধ ছিল। প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর আবার পূজার্চনা শুরু হয়। এখন রমনার মতোই সরকারি অধিগ্রহণের মুখে পড়লো এই ঐতিহাসিক তীর্থস্থান।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের এক সভায় সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণের নামে দয়াময়ী মন্দির ও রাধামোহন জিউ মন্দিরের যথাক্রমে ৬১ শতক এবং ১৩ দশমিক ৫০ শতক জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই মর্মে ভুল তথ্য সভায় উপস্থাপিত হয় যে, প্রস্তাবিত এই জমিতে ধর্মীয় উপাসনালয় বা শ্মশান নেই। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, অধিগ্রহণের জন্যে নির্ধারিত পুরো জমিই দয়াময়ী মন্দির ও রাধামোহন জিউ মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি এবং এই ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক দুই মন্দিরের বেশির ভাগ অংশ ও স্থাপনা। সাংস্কৃতিক পল্লী বাস্তবায়িত হলে অপূর্ব স্থাপত্যকলার নিদর্শন দুই মন্দিরের অংশ ও সিংহদুয়ার, মন্দিরের প্রবেশ পথ, মন্দিরের পুরোহিত-কর্মচারীদের বাসস্থান, মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্যে স্থাপিত বাণিজ্যিক কেন্দ্র ভেঙে ফেলতে হবে। মন্দিরের যে পুকুর রয়েছে তাও অধিগ্রহণের আওতায় পড়ছে। পুজোর কাজে এই পুকুর ব্যবহৃত হয়, এখানেই প্রতিমা নিরঞ্জন হয়, বিয়ে ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত জেলা প্রশাসকের কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন, এই সিদ্ধান্ত এ দেশের আড়াই কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিদারণভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করেছে। এই দুই মন্দির কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শুধু ধারণ করছে না, এর সঙ্গে ধর্মপ্রাণ হিন্দু জনগণের অনুভূতিও যুক্ত।

একই দলখলদারির ঘটনা ঘটছে নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জ শহরের মাসদাইরে অবস্থিত প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন মহাশ্মশানের জলাধারটি ধীরে ধীরে দখল হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় আওয়ামি লিগ সাংসদ ও প্রশাসনের সমর্থনে জলাধারটি ধীরে ধীরে ভরাট করে দখল করে নিচ্ছে মনির হোসেন নামে শাসক দলের এক নেতা। শ্মশানে পারলৌকিক কর্মকাণ্ডে জলাধারটি ব্যবহৃত হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আইভি রহমান হিন্দু সমাজের পক্ষে দাঁড়ালেও সাংসদ ও প্রশাসনের দাপটের কারণে দখলদারিত্ব অব্যাহত রয়েছে।

স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্য

শ্রীবাবা সাহেব আপ্তে

প্রায়ই একটা কথা শুনতে পাওয়া যায় যে, আমরা স্বরাজ পেয়েছি ও স্বাধীনতা ভোগ করছি। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কী? কতকগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করার নামই কি স্বাধীনতা? অবশ্য আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বোঝানোর চেষ্টা করছে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগুলো অধিকার লাভের অর্থই স্বাধীনতা। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই আমরা সহজে এর অসারতা ধরতে পারি। স্বাধীনতা সব দিক দিয়েই এক স্বতন্ত্র সত্তার জন্ম দেয়। স্বাধীনতার অর্থ জাতির প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজগতভাবে নিজের মধ্যে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কর্মের পেছনে এই জাগ্রত চেতনা কাজ করবে যে 'আমি স্বাধীন', 'আমি স্বতন্ত্র'। নিজের সমাজ জীবনে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে মিলিত কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে সে আপনার এই স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেবে। এই স্বতন্ত্রতাবোধের প্রকাশই প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচায়ক। যখন জাতির মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দেবে তখনই তার স্বাধীন-সত্তার দীপ্তিতে সমস্ত জাতির চেহারাই উজ্জ্বল ও দীপ্যমান হয়ে উঠবে। অতএব, দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই স্বাধীনতার সাধনা।

ভারতবর্ষে আমরা এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ভারতীয় সভ্যতা জগতে একক ও অনন্য সভ্যতা। পৃথিবীর সকল জাতি ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের কাছে তার ঋণ স্বীকার করেছে। তাই আজও জগতের প্রত্যেক নিরপেক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন জাতি চায় যে ভারতবাসী আবার তার পূর্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা ভারতকে তার সেই পূর্বের গৌরবময় আসনে দেখতে চায়। এর অর্থ এই যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা জগতে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছিল আজকের ভারতে তার সামান্যতম প্রকাশ দেখা যায় না। প্রসঙ্গত আমি একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিজের একটা ফোটো তার জার্মানির এক pen-friend-এর কাছে পাঠিয়েছিল। জার্মান বন্ধুটি তার ফিট্‌ফাট ইউরোপীয় বেশে সজ্জিত ভারতীয় বন্ধুটির ফটো দেখে খুব আঘাত পায়। ভারতীয় বন্ধুর এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করে সে ফোটোটি তাকে ফেরত পাঠিয়ে ভারতীয় বেশে একটি ফোটো পাঠাতে অনুরোধ করে। বিদেশি ব্যক্তির এইরকম নিরপেক্ষ দৃষ্টির কথা হয়তো আজ আমাদের দেশে যথোপযুক্ত মনে হবে না। কিন্তু তা-হলেও এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে এই ঘটনা আমাদের কাছে খুব বড় একটা সত্য উদ্ঘাটিত হলো, জগতের লোক চায় এবং আশা করে যে, 'আমরা যেন আমাদের মতো হই।'

এখানে আমরা জীবনের মূল্যমানের (Values of life) প্রশ্নের তত্ত্বগত কোনও আলোচনা করছি না। এখানে কেবল আমরা একটা সাধারণ ধারণার কথা বলছি— যে ধারণা থাকা প্রত্যেকটি স্বাধীন জাতির পক্ষে একান্ত অনিবার্য ও বাস্তব সত্য। এই ধারণা হচ্ছে জাতির পূর্ব ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা যা জাতিকে তার স্বতন্ত্র পরিচয় বুঝতে সাহায্য করে।

বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বোঝাবার পক্ষে একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক। যেমন, আয়ুর্বেদ। ভারতীয় সংস্কৃতির মানকে হীন প্রতিপন্ন করা ব্রিটিশ শাসকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাই তারা সর্বতোপায়ে আয়ুর্বেদের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের নানারকম সুযোগ সুবিধা ও সাহায্য দিয়ে তারা অ্যালোপ্যাথিকে ফাঁপিয়ে তুলল। সমাজে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের সামনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অত্যন্ত হীন ও দীন প্রতিভাত হলো। অভ্যন্তরীণ প্রকৃত ঐশ্বর্যের চেয়ে লোকের কাছে বাহ্যিক আড়ম্বরটাই বড় হয়ে দেখা দিল। এইভাবে আয়ুর্বেদ মূল্যহীন হয়ে পড়াতে লোকে আয়ুর্বেদের চর্চা ছেড়ে দিতে লাগলো। আয়ুর্বেদ-পণ্ডিতের চেয়ে সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর অ্যালোপাথিক ডাক্তারের কদর বেড়ে গেল। বংশানুক্রমে অর্জিত ও সঞ্চিত এই মহাশাস্ত্র যাকে বলা হয় 'আয়ুর বেদ' (science of life) বলা হয় তা এই ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসলো। তবুও আয়ুর্বেদের ওপর যাদের অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল তারা প্রয়োজনের সময় প্রকৃত আয়ুর্বেদ পণ্ডিতের সন্ধান পেলেন না, কারণ ইতিমধ্যেই এই শাখা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ফলে তাঁদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও আর অটুট রইলো না। এই ভাবে আয়ুর্বেদকে নষ্ট করবার জন্য একটা 'ভিশাস সার্কেল' (vicious circle) আপনা থেকেই গড়ে উঠলো। স্বাধীনতা লাভের পরও এই অবস্থার এতটুকু উন্নতি হয়নি। আজকের দিনে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের তথাকথিত পণ্ডিতেরা তো বিনা-দ্বিধায় অ্যালোপ্যাথিক ও নানারকম পেটেন্ট ওষুধের আশ্রয় নিচ্ছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রাচীন পণ্ডিতদের এক-একজনকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শাস্ত্রের মূল্যবান সব সম্পদ হারিয়েছি। স্বাস্থ্যের যাঁরা সংরক্ষক তাদের হারানোতে জাতি হীনবল হয়ে পড়বেই।

ঠিক এই একই কথা সংস্কৃত ভাষা ও তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। একজন প্রকৃত সংস্কৃতজ্ঞ আজ সারাদিন পরিশ্রম করেও নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে চালাতে পারেন না। আজকের সমাজে তিনি বিশেষ সম্মাননীয়ও নন। কিন্তু একজন সাধারণ ম্যাট্রিকুলেট সেক্ষেত্রে একটা চাকরি জুটিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে ও সম্মানের সঙ্গে আপনার জীবন নির্বাহ করতে পারে। তাই দেখতে পাই যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর ছেলেদের স্কুলে ইংরেজি পড়তে পাঠাচ্ছেন

এবং তাঁর ছেলেরা যাতে ইংরেজি শেখে। সংস্কৃত পণ্ডিত হয়ে আজীবন দুঃখ-কষ্টের ভাগী যাতে না হয় তার জন্য জোর দিচ্ছেন। আজ বোম্বাইয়ের মতো একটা বড় শহরে এই কারণে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্যের জন্যে একজন ভালো পুরোহিত মেলা কঠিন হয়ে ওঠে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা সেই একই 'ভিশাস সার্কেল'-এর আবর্তন দেখতে পাই।

কিন্তু সবচেয়ে বড় আঘাত পড়েছে আমাদের স্থাপত্য ও বিবিধ কারু শিল্প-শাস্ত্রের ওপর। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং। সারা দেশে এই যে এত মন্দির, দুর্গ, স্থাপত্য যা কালের গতিকে পরাভূত করে আপনার অক্ষয় গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— পৃথিবীতে এর তুলনা কোথায়? আজও এর কলা-কৌশল এবং শিল্প-সাধনা মানুষের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। হাজার বছরের পুরনো দিল্লির 'বিজয়স্তম্ভ' আজও জগতের লোকের কাছে এক রহস্যময় জিনিস বলে মনে হয়। এর সূক্ষ্ম অপূর্ব গঠন, এইসব স্থাপত্যের গঠনভঙ্গি এবং এমনকী তার গাত্রে যে-সকল সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অনন্য শিল্প সাধনা দেখা যায়, তা দেখে প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা নিশ্চয় অমরলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন! তা না হলে এ সৃষ্টি সম্ভব হলো কী করে? কিন্তু আজ আমরা আমাদের এই মহান কৃতিত্ব সম্বন্ধে এতটুকু ঔৎসুক্য বোধ করি না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ খুলে এই শিল্প-শাস্ত্রের সূত্রের সন্ধান করতে আমরা বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাই না। আজ যাঁরা আধুনিক ভারতের নির্মাণকর্তা বলে দাবি করেন তাঁদের এদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। তাঁরা বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়ে দেশ গঠন করেছেন! অথচ, এই কিছুদিন আগে মহীশূরে বিমান সম্বন্ধে একটা প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন আমেরিকান এসে বেশ মোটা টাকা দিয়ে পুঁথিটি কিনে নিয়ে চলে গেলেন। আর আমরা এই জিনিসটাকে পুরনো পুঁথির বেশি আর কিছু মূল্য দিলাম না।

বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে, আমাদের নেতারা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে অন্ধ। ভারতের রাজধানী দিল্লি আজ পশ্চিমের অনুকরণে একটা সাধারণ শহর হয়ে গড়ে উঠেছে। বলতে পারেন, দিল্লি তো আমরা তৈরি করিনি, ব্রিটিশরা করেছে। বেশ, ১৯৪৭ সালের পর ভারতে যে কটি বড় শহর তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কটা খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় আবহাওয়ার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে? একটাও না। যেমন চণ্ডীগড়। একেবারে হাল আমলে তৈরি করা শহর। কিন্তু কারা করেছে? বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারেরা, এদেশের জল-মাটি- আবহাওয়ার সঙ্গে যাঁরা ভালো করে পরিচিত নন। এইরকম আরেকটা নতুন শহর নাঙ্গাল। বিশ হাজার লোকের বাস এ শহরে। অথচ এই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে একটা মন্দিরের স্থান রাখা হয়নি। না, এখানে কোনও মন্দির তৈরিই করতে দেওয়া হয়নি। কে বলবে যে এটা ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত একটা জায়গা— যে ভারতবর্ষ সাধু-সন্তদের ভূমি! এই ভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণের অন্ধ মোহে মত্ত হয়ে ভারত যদি তার নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা যা শত সহস্র আক্রমণকে অস্বীকার করে নিজের প্রাণশক্তিতে শক্তিশালী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে, তার বিলুপ্তি অনিবার্য। আজও আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা সংস্কৃত ঠিকমতো পড়তে ও তার ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে হয়তো আর এ রকম লোক থাকবে না। সংস্কৃত তখন গ্রিক, ল্যাটিনের মতোই আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হবে।

একটা হিন্দুঘরে অতিথি যে সম্মান ও আপ্যায়ন লাভ করতেন তা কেউ কল্পনাই করতে পারে না। অতিথি নিজেদেরই লোক, অপর ব্যক্তি নন— এ ধারণা গৃহস্বামী ও অতিথি উভয়ই অনুভব করতেন। আজ হোটেলে অর্থের বিনিময়েও লোকে এত আদর আপ্যায়ন লাভ করে না। সমস্ত সনাতন শুদ্ধ নিয়মই যেন আজ উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। বংশগত পেশা অনুসরণ না করে যে কেউ আজ সেলুন, কাপড় ধোয়ার দোকান খুলে বসছে। ফলে অর্থের প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে কিন্তু কাজের অবনতি বই কোনও উন্নতি হয়নি। এইভাবে আমাদের দ্বারা সমাজ-জীবনটাই দিন-দিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে এর প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই না। এই প্রতিক্রিয়া এমনই ভয়ঙ্কর যে আমাদের সুস্থ সামাজিক সংগঠনেও আজ ফাটল ধরতে সুরু হবে। এ ফাটল ভিত্তিভূমি স্পর্শ করে একে মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলবে।

তাই আজ প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের সচেতন হওয়া দরকার। যে হিন্দু তার দেশকে আন্তরিক ভালবাসে, দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে, ভারতভূমিকে যে মা ব'লে ডাকে— সে আজ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, নিজের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হতে হবে, গ্রামে, নগরে, হাটে-গঞ্জে, লোকের দরজায় দরজায় গিয়ে ঘা দিতে হবে, তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে, বলতে হবে, 'ওঠ, জাগো, দেখ, আমরা কী ছিলাম, কী হয়েছি আর কী হতে বসেছি।' নিজের মান-অপমান, নিন্দা প্রশংসা সবকিছুকে তুচ্ছ করে এই মহান ব্রতে অগ্রসর হতে হবে। আপনার আপনত্বকে বিসর্জন দিয়ে এই সর্বনাশা ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। হিন্দু-সংস্কৃতির হিন্দু-ভূমির হৃতগৌরব উদ্ধারের দায়িত্ব আজ সব হিন্দুরই অনুভব করতে হবে। আপনার আপনত্বকে বিসর্জন দিয়ে এই সর্বনাশা ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। হিন্দু সংস্কৃতির হিন্দু-ভূমির হৃতগৌরব উদ্ধারের দায়িত্ব আজ সব হিন্দুরই অনুভব করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এবং এই দায়িত্বে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আজ জাতীয় প্রচারকের প্রয়োজন! একমাত্র নিঃস্বার্থ জাতীয়তার প্রচারকদের দ্বারাই এই দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হবে। তারা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হিন্দুভূমির গৌরবময় ইতিহাস লোকের সামনে তুলে ধরবে। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য দেশমাতৃকার আহ্বান তারা লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে, নবজাগরণ মন্ত্রে আপামর সাধারণ দেশের লোককে দীক্ষিত করবে— তবেই আমরা আমাদের পূর্ব-অধিকার ফিরে পাব। তখনই স্বাধীনতার আজন্ম সাধনা যথার্থ সিদ্ধিলাভ করবে।

(সংক্ষেপিত, স্বস্তিকার ১৯৫৮ পূজা সংখ্যা থেকে পুনঃপ্রকাশিত)

ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম সম্পর্কে অতি সুন্দর কথা বলেছেন : 'অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারত এক অভিনব ধর্ম গ্রহণ করবে তার নাম সেবাধর্ম। এখন পর্যন্ত এই ধর্মের পূর্ণ উদ্দীপনা হয়নি। যেটুকু হয়েছে সেইটুকু অতি ভাসা-ভাসা। কিন্তু শীঘ্রই হবে, সহস্র সহস্র ত্যাগীর জীবনোৎসর্গের ফলে। সেদিন একবাক্যে সকলে এই ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করবে। কিন্তু তাই বলে ভেবো না যে, ব্যক্তিগত সাধনধর্ম কাউকে বর্জন করতে হবে। শাক্ত শাক্তই থাকবে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবই থাকবে, ব্রাহ্ম ব্রহ্মকেই উপাসনা করবে। প্রাণের আধ্যাত্মিকতার তৃষ্ণা মিটাবার জন্য মুসলমান খোদাতালারই পূজা করবে, হিন্দু বেদ-বিধানই মানবে, খ্রিস্টান খ্রিস্টকেই ভজবে। নিত্য নিত্য আধ্যাত্মিক ধর্মে প্রত্যেকে থাকবে পৃথক, পরন্তু সেবার ধর্মে সবাই হবে এক। সেবাধর্মের অনুশীলনের জন্যে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ধর্মমত বা ধর্ম পথকে বিসর্জন দেওয়ার দরকার পড়বে না।' ভারতের বর্তমান মোদী সরকারের কার্যকলাপ শ্রীশ্রী বাবামণির কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তিনিও সেবাধর্মের ভিত্তিতেই নতুন ভারত নির্মাণের পথে এগিয়ে চলেছেন।

—জগৎ চন্দ্র রায়,
বুরগাও, মরিগাও (অসম)।

আম্বেদকরকে নিয়ে রাহুলের রাজনীতি

দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে মুসলিম লিগ যে খেলা খেলেছিল তারই প্রতিধ্বনি এখন শোনা যাচ্ছে। ওই খেলাতে মুসলিম লিগ সম্মুখ সমরে নেমেছিল, যার ফলে ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয় নিহত হয়েছিল, কয়েক লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছিল এবং কয়েক কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। এবারও পেছন থেকে সেই আগুনে হাওয়া দিচ্ছে মুসলিম লিগ। তারা শিখণ্ডী হিসাবে সামনে রেখেছে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে। স্বাধীন হওয়ার ৭০ বছরের মধ্যে দেশ বিজেপি দ্বারা শাসিত হয়েছে (৫ + ৪) ৯ বছর। বাকি ৬২ বছর শাসিত হয়েছে কংগ্রেস দ্বারা। তখন কি দলিতদের উপর অত্যাচার হয়নি? আজ রাহুল গান্ধী এবং তার দল মুসলিম লিগের দোসর হয়ে দলিতদের বান্ধব সেজেছে। রাহুল গান্ধীকে অনুরোধ, আগের দিনের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভার ফটোগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিন। তখনকার দিনে ওই সভাগুলি হতো গদিতে বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। বাবু জগজীবন রাম (এস.সি.)-এর সঙ্গে কি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতেন অন্য নেতারা? এমনকী বাবু জগজীবন রাম গদিতে থাকলে অন্য নেতারা জল চা পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। বাড়ি গিয়ে স্নান করে মাথার গান্ধী টুপি ধুয়ে নববস্ত্র পরিধান করে জল ও খাদ্য গ্রহণ করতেন। ভারতে মুসলমানরা দলিতদের জন্য কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। তারা কি জানেন না গত কয়েক বৎসর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলিতে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে কয়েক লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন এবং কয়েক কোটি মুসলমান ইউরোপে আশ্রয় নিয়েছেন। বাবাসাহেবের বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দ্বেষের কারণগুলি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ব্যক্তিগত জীবনে বাবাসাহেব বর্ণহিন্দুদের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। বর্ণহিন্দু সয়াজিরাও গায়কোয়াড়ের অর্থ সাহায্য ছাড়া তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের উচ্চাশাই পূর্ণ হতো না। তিনি ছিলেন মাহার সম্প্রদায়ের লোক। মহারাজা প্রতি মাসে তাঁকে ৫০ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মহারাজার আর্থিক সাহায্যে তিনি কলেজে এবং আমেরিকায় গিয়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহায়তায় বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ড. সারদা ব্রাহ্মণ (সারস্বত) কন্যা ছিলেন। তিনিও তো জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে দলিত আম্বেদকরকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি যে আম্বেদকর পদবিটি ব্যবহার করতেন তাও তো তাঁর এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের পদবি যা তিনি

ব্যবহার করার জন্য ভীমরাওকে দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে জাতহীন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অতএব তাঁকে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করে দলিত-মুসলমান ঐক্য এবং ভারত ভাগ করে দলিতদের জন্য আলাদা 'হরিজন স্থান' তৈরির ডিমে তা দিচ্ছে ভারতস্থ মুসলিম লিগের বংশধররা। সর্বশেষে দলিত ভাইদের অনুরোধ, মুসলিম লিগের প্রাণের দোস্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্র মণ্ডলের পদত্যাগপত্রটা একবার পড়ে দেখুন।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
বিধানগর, কলকাতা-৬৪।

জাতিটা যুযুধান দুটি হরিণ

সেদিন ফেসবুকে একটা ভিডিয়ো দেখছিলাম। দুটি হরিণ মারামারি করছে, এমন সময় একটি বাঘ এসে একটি হরিণকে মুখে করে তুলে নিয়ে গেল। অপর হরিণটি তখন দৌড়ে পালিয়ে গেল। আজ ভারতের অবস্থা ঠিক যুযুধান দুই হরিণের মতো। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ নিয়ে লড়াই করছি। বাঙালি ও বিহারি, মরাঠি, পঞ্জাবি, ব্রাহ্মণ, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি ইত্যাদি। খুব কমজনই ভাবে যে আমরা ভারতবাসী, আমরা হিন্দু। আমরা সবাই মানবধর্মে বিশ্বাসী, শুধু নেতারা নয়, বহু শিক্ষিত মানুষও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কত তর্ক আলোচনা করে। তাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা। হিন্দু ধর্মের পক্ষ নেওয়া তো দূরের কথা, নাম উচ্চারণ করতে ভয় পায়। অপরপক্ষে মুসলমানদের হয়ে কত সাফাই। আমরা নিজেদের মধ্যে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি ও নানা দল নিয়ে মারামারি

কাটাকাটি করি। কিন্তু একদিন ইসলামরূপী বাঘ যে আমাদের গ্রাস করে নেবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করি না বা কাজ করি না। আমরা হরিণের মতো নিজেদের মধ্যে লড়াই করি। আমাদের বাঁচাবে কে?

—**কমল মুখার্জী,**
ধরমপুর, চুঁচুড়া।

অতি আধুনিকতা সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

আজকের আধুনিকতা তথা প্রগতিশীলতার নামে আমাদের ঘরের তথাকথিত শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের প্রকাশ্য দিবালোকে ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জায়গা হলো ট্রেন-বাস, পার্ক, ময়দান, নন্দন এবং সর্বোপরি মেট্রোরেল। এই জায়গাগুলি বেছে নেওয়াটা নিছক পরিকল্পনাহীন ঘটনা নয়। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে এগিয়ে চলছে ওইসব উচ্ছৃঙ্খল ছেলে-মেয়েরা। এর রহস্য ভেদ করা অবশ্যই জরুরি। ওই অতিশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা দুটি শব্দের সঙ্গেই বেশি করে জড়িত। এই দুটি শব্দ প্রগতিশীলতা এবং অতি আধুনিকতা, যা অনেকটাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী। এর ভিত্তিভূমি ইউরোপ-আমেরিকা। আমাদের দেশে এর আগমনের কৌশলগত একটা দিক আছে। এর নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু এগিয়ে চলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। ভারতবর্ষ এর সঙ্গে আপস করতে গিয়ে ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলি কোনওকালেই বিসর্জন দেয়নি। দেয়নি বলেই ভারতবর্ষ শত-সহস্র বছরের আঘাতেও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রয়েছে। অপরদিকে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বর্তমানে ইরাক, মিশর, ইরান এবং ইউরোপের অনেক দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ছে। তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলে ঐশ্বর্য ও বিলাসে মত্ত। অতি সম্প্রতি মেট্রোরেলে প্রকাশ্য চুম্বন দৃশ্যের সপক্ষে ফেসবুকে নিত্য লেখালেখি করা এক শ্রেণীর কবি ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কলমে ওই যুবক-যুবতীর প্রতি সহানুভূতির শব্দবাণী শুনি, তখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওরা কারা? এই দৃশ্য সত্তর দশকের গোড়ায় হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়েছিল এবং মিলিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আশির দশকে একটা স্থায়ী পালাবদলে একটা বিদেশি মতাদর্শকে স্থায়িত্ব দেওয়ার সংকল্পে কিছু ছেলে-মেয়ে চাঁদমারি করলো। তার নমুনা আজ দিল্লির জে এন ইউ থেকে হালের কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নমুনা প্রদর্শিত হচ্ছে। যাদের এদের নিবৃত্ত করা অতীব দরকার তাঁদের আশ্চর্য নীরবতা কোন শুভলক্ষণের ইঙ্গিত বহন করে আনছে? এর উত্তর হয়তো একদিন পাওয়া যাবে কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

ভোট একটা হলো বটে!

পঞ্চায়েতের ভোটে যে রক্তাক্ত ঘটনা বঙ্গজুড়ে ঘটলো, তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। ক্ষমতার লোভে, মুখভাণ্ডের লোভে এই সন্ত্রাস। স্বস্তিকার 'ছিঃ' সম্পাদকীয় সময়োপযোগী, 'ব্যালট তোমায় গান স্যালুট' দারুণ দূর্দান্ত হয়েছে। সুন্দর মৌলিককে ধন্যবাদ। বঙ্গে পরিবর্তন এসেছে বৈকি ওইরকম রক্তাক্ত ভোট পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়। আমার পরিচিত অনেকে বলেছেন, তাঁরা ভোট দিতে গেলে বলা হয়েছে, ভোট হয়ে গেছে। ক্ষমতা কি না পারে?

—**অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

পশ্চিমবঙ্গে কি সবই পচা?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি নাকি বর্তমানে পৃথিবীর সেরা। আসলে এই রাজ্যটি শেষের প্রথম। এখানে নেই কোনো গণতন্ত্র; শুধুই মস্তানতন্ত্র, বাহুবলীতন্ত্র। বর্তমানে যে পঞ্চায়েত ভোট হয়ে গেল বহু ভোটারকে কোনও কষ্ট করতে হলো না, ভোটদানের জন্য বেশিরভাগ জায়গায়ই লাইনে দাঁড়িয়ে রোদে কষ্ট পেতে হলো না। সহৃদয় তৃণমূলিরা ভোটারদের জন্য সহমর্মিতার এক একটি প্রতীক হিসাবে কাজ করে চলেছিল। যে ভোট হয়ে গেল তা মস্তানীরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে সকলেই মনে করছে। বিগত ৩৪ বছরে সিপিএম যা পারেনি, ১৯৭২-এর আতঙ্কের আমলে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস যা পারেনি বর্তমানের স্বচ্ছ, সত্যবাদী, সাদামাটা পোশাকধারী দিদি সামান্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা করে দেখালেন। এরপর মনে হয় না কোনও সরকার তা করে দেখাতে পারবে। আসলে আমাদের সাধের পশ্চিমবঙ্গের পচন ধরেছে। ভাগাড়কাণ্ড তার জ্বলন্তপ্রমাণ। বজবজের যেখানে মরা জন্তু— গোরু, শুয়োর, কুকুর, বিড়াল, মুরগি ফেলা হয় সেই ভাগাড়ের আজও কোনও গেট নেই, নেই কোনও নৈশ প্রহরী। এই আমাদের রাজ্য। এখানে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি খেতাব দিয়ে নাম কেনার জন্য মুঠো মুঠো টাকা নারদা, সারদা এমনকী ভাগাড়ে বিশুর কাছে আদায়ীকৃত তা গৌরী সেনের মতো দান করা চলছে। আর রাজ্যে যে পচা মাছ, মাংস, ছানা, মিষ্টি এমনকী পানমশলা দেদারে মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে তার বেলা শাসকের হুঁশ নেই।

বিশেষ সংবাদ, নবান্ন ও পুরসভায় মাংস আজ ব্রাত্য অথচ মেয়র বলছেন মাংস খেতে। অর্থাৎ জনগণ মরলে কোনও ক্ষতি নেই মন্ত্রীরা মরলে চলে কি? এই যে এত কাণ্ড হলো বড় বড় হোটেল রেস্তোরাতে পচা, ছাতাধরা মাংস ধরা পড়লো তার ফরেনসিক রিপোর্ট নেই কেন? কেন রিপোর্ট তৈরিকে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তদন্ত কমিশন বসিয়ে এককাঁড়ি অর্থ খরচ করে লোকদেখানো অভিযান করা কেন? ভাগাড় বিশু ধরা পড়লেও পচা ও ভাগাড়ের মাংসের কারবারি কওসর আজও বেপাত্তা কেন? লোকের মনে সন্দেহ তো জাগবেই।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

নবরূপে বিকশিত হোক নারী

পদে পদে বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে মেয়েদের পূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সেদিন মেয়েরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখবে এবং এক বৈষম্যহীন সমাজের নির্মাণ হবে।

অনিন্দিতা সরকার

নারী মানেই পড়তে হবে, লড়তে হবে, জিততে হবে। তবে সব ক্ষেত্রেই তারা জেতে না। কিন্তু জেতার অদম্য ইচ্ছা তাদের বহুদূরের পথ চলতে সাহায্য করে। নারী মানেই দশভুজা। কোথায় তাদের দশটা হাত? আছে, তবে অদৃশ্য। সেই দশ হাতের কর্মক্ষমতা তারা মনের মধ্যে পোষণ করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছরই পালিত হয় ঘটা করে। তারপরও নারীরা আওয়াজ তোলে স্পেস ফর প্রোগ্রেস। স্বাধীনতার এত বছর পরও লিঙ্গবৈষম্য রয়ে গেছে সমাজে। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেয়েদের উৎসাহিত করার কাজ চলছে জোরকদমে। বহু ক্ষেত্রেই নারীরা আজ প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে। সেজন্যই বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে কোনও না কোনও নাবালিকা নিজেই রুখে দাঁড়াচ্ছে কম বয়সে নিজের বিয়ের বিরুদ্ধে। পার্বত্য অঞ্চলের বহু মহিলা আজ স্বনির্ভর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাকী সংসার চালাচ্ছেন, কিংবা স্বামীর পাশে থেকে তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছেন। ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, প্রাক স্বাধীনতা কালে বহু মহিলা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মেদিনীপুরের তেজস্বিনী মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরার পুঁথিগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। পুরুষদের পাশে থেকেছেন স্বমহিমায়। স্বাধীনতার পরে প্রধানমন্ত্রী থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চপদে কাজ করার নজির রেখেছেন।

মেয়েরাই পারে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করতে। মেয়েদের বৈশিষ্ট্য হলো শালীনতা ও সহনশীলতা বজায় রাখা। বাস্তব ক্ষেত্রে মেয়েদের সংসার চালাতে গিয়ে পরিবারের শান্তি রক্ষা করতে হয়। যেমন মা দুর্গার মধ্যে আমরা দেখি কখনও সংহার রূপ, আবার কখনও তিনি শান্তি প্রদায়িনী, শান্ত স্বভাবের এক মূর্তি। ইতিহাসে এমন বহু নারী চরিত্র রয়েছে যারা সংসারধর্ম পালন করেও সামাজিক কল্যাণে অংশগ্রহণ করেছেন। সমাজের অনেক কুসংস্কার তাঁরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন রানি রাসমণি নারীসুলভ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সামাজিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এটা মানতেই হয় ভারতীয় সংস্কৃতির মানবিন্দুগুলির ধারক ও বাহক মেয়েরাই।

সমাজে ক্ষমতায়ন নিয়েও বৈষম্য ধরা পড়ে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও নারী ক্ষমতায়নের মাপকাঠি নয়। আর্থিকভাবে স্বাধীন মেয়েদেরও নানাভাবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এই মানসিকতার যেদিন বদল হবে, সেদিনই হবে প্রকৃত নারী দিবস। বার বার বলা হয় আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। এই ধারণাকে মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা সমাজ পরিচালনা করতে পারে তার নিদর্শন শত শত রয়েছে। একজন নারীর জীবন প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। বাড়িতে ছেলে ও মেয়ে একই সঙ্গে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও সদ্য কিশোরী মেয়েকে নিয়ে বাবা-মা যেন একটু বেশিই চিন্তিত থাকেন। বয়ঃসন্ধির পর একটা মেয়ের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে। সংসারে তখন যদি ছেলে-মেয়ের বিভাজনটা বেশি মাত্রায় প্রকাশ পায়, তখন মেয়েটি মানসিক সমস্যায় ভোগে। এর অবশ্যই পরিবর্তন প্রয়োজন।

বহু ক্ষেত্রেই মেয়েদের বলা হয় ঘরকন্নার কাজ শিখতে। বহু অভিভাবক বলেন, যতই পড়াশোনা কর, মেয়েদের হাতা-খুন্তিই নাড়তে হবে। আবার অনেকের মতে, পড়াশোনা শিখে কী হবে? একদিন তো শ্বশুরঘরে যেতেই হবে। খুব কম মেয়ে এই সময় পরিবারের সহানুভূতি পায়। অথচ এই সময়ে মেয়েদের মা-বাবার সহানুভূতি দরকার। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরাও বলতে থাকে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। কুড়ি বছর পার হতেই মেয়েদের জীবন অন্য খাতে বইতে শুরু করে। কম লোকই বলে মেয়েকে ভালো করে উচ্চ শিক্ষিত করতে হবে। নিজের পায়ে আগে দাঁড়াক, তারপর বিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করা যাবে ।

বিয়ের পর যখন মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে যায় তখন তাকে প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙে এক অন্য মাত্রায় দাঁড় করাতে হয়। তাই মেয়েদের সবসময় সহানুভূতি ও উৎসাহ দেওয়াই উন্নত সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। পদে পদে বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে তাদের পূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সেদিন মেয়েরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখবে এবং এক বৈষম্যহীন সমাজের নির্মাণ হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

সত্যানন্দ গুহ

আমরা সভ্য মানুষ রান্না করা ও নানা রকম মশলাযুক্ত মুখরোচক খাদ্য খেয়ে নানা রোগে ভুগছি। অল্পায়ু ও রোগগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ রান্না করা খাদ্য গ্রহণ। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যান্ন রান্না করে খেলেই গেঁজিয়ে ওঠে এবং অম্লধর্মী হয়ে বহুমূত্র, স্থূলতা, ক্ষীণতা, বাত, হৃদরোগ প্রভৃতি নানা রোগের সৃষ্টি করে।।

শ্বেতসার না রেঁধে খেলে সামান্য গেঁজিয়ে উঠলেও অম্লধর্মী নয়। বরং পাকস্থলীর অম্ননাশক। তাই পুজোপার্বণে চালবাটা, আটা, সুজির সিন্নির মতো ক্ষারধর্মী খাবার খেলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

আমরা রান্না না করে খাবারের কথা ভাবতেই পারি না। ভাত, ডাল ,রুটি, তরিতরকারি মাছ, মাংস ইত্যাদি রান্না করে খেতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে আলু, মুলো, বিট, গাজর, শসা-সহ যেগুলি কাঁচা খাওয়া যায় তা রান্না না করেই খেতে হবে। বাঁধাকপি, ফুলকপি রান্না করে খেলে বদহজম হয়, কিন্তু কাঁচা খেলে সহজেই হজম হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা নিয়মিত কাঁচা খাবার খায়। ভারতের অবাঙালিরা ডাল, মুলো, বিট, গাজর ইত্যাদি কাঁচা খান। বাঙালিরাই এবিষয়ে উদাসীন, অনিয়মিত বা অনিয়ন্ত্রিত। তাই ৪০/৪৫ বছর বয়সেই বাঙালিরা কোনও না কোনও রোগের শিকার হন।

বয়সের কারণে মানুষ বৃদ্ধ ও অশক্ত হয় না, রোগের জন্যই হয়। কাঁচা খাদ্যগ্রহণকারীদের পেশী শক্তসমর্থ হয়। কাঁচা খাদ্য চিবিয়ে খেতে সময় বেশি লাগে, ফলে বেশি লালা মিশ্রিত হয়। দাঁত শক্ত হয়,হজমে ব্যাঘাত ঘটে না। আজকাল একশ্রেণীর ডাক্তার কাঁচা শাকসবজি খেতে বারণ করছেন। তাতে নাকি জীবাণু সহজেই শরীরে ঢুকে যেতে পারে। আংশিক সত্য হলেও ওই জীবাণু জঠরাগ্নিতে ধ্বংস হয়ে যায়। শরীরের ছিদ্রপথে নানা জীবাণু অনায়াসে ঢুকতে পারে। কিন্তু শরীরের অভ্যন্তর দূষিত না থাকলে তারা কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

অনেকের ধারণা কাঁচা খেলে বদহজম হবে। কিছুদিন কাঁচা খাদ্য গ্রহণ করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে। পাকা ফল আমরা রান্না না করে খাই। মুলো, বিট, গাজর, শশা, টমেটো,ধনেপাতা,কাঁচালংকা, পেঁয়াজ, শাকালু, রাঙালু, আপেল, পেয়ারা এমনি কত ফলমূল আমরা কাঁচা খেয়ে থাকি। ভেজা ছোলা, মুগ, আদা,আতপ চালের সিন্নি, আটার সিন্নি খেয়ে আমাদের দিব্যি হজম হয়। তেমনি অন্য খাদ্যগুলিও হবে। আগুন আবিষ্কারের আগে আদিম মানুষ কাঁচাই খেত।

একজিমা ও পাথুরি রোগের মূল কারণ শাকসবজি না খাওয়া। উদ্ভিদ সূর্য হতে শক্তি সঞ্চয় করে। সেজন্য সবুজ শাকসবজি হলো সম্পূর্ণ খাদ্য। প্রয়োজনীয় ভিটামিন, লবণ সবই এতে পাওয়া যায়। ধনেপাতা, গাঁদালপাতা, নটেশাক,থানকুনি ইত্যাদি গ্রহণে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। বাঁধাকপির উপরের সবুজ পাতা, ফুলকপির সবুজ পাতা ফেলে দিতে নেই। সবুজ পাতায় সিএ, এফ ই, আই থাকে। শস্যের চেয়েও বেশি ধাতব লবণ থাকে। পালংশাকে প্রচুর আয়রন থাকে। তা রক্তাল্পতা রোগীর পক্ষে খুবই উপকারী। শাকসবজির ভিটামিন রান্না করলে নষ্ট হয়ে যায়। বাসি ও শুকনো শাকপাতা সর্বদা বর্জনীয়। খেলেই পেটে বায়ু হবে। মহর্ষি চরক বলেছেন, প্রকৃতিকে সর্বদা অনুসরণ করবে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার শাস্তি রোগ আর অনুসরণ করার পুরস্কারের নাম স্বাস্থ্য। তাই প্রকৃতির সবুজ পাতার মধ্যেই সমস্ত ভিটামিন পাওয়া যায়। ভিটামিন-এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তা পাওয়া যায় সবুজ শাক, পান, কড়াইশুঁটি, নিমপাতা, পালং,পুঁই, বাঁধাকপি ও টমেটোতে। ভিটামিন বি-১ ও বি-২ স্নায়ু সবল করে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। তা পাওয়া যায় সয়াবিন, বাদাম, মুগ প্রভৃতিতে। ভিটামিন বি২ রক্তাল্পতা দূর করে ও জীবনীশক্তি বর্ধক। পাওয়া যায় বেগুন, আম, করলা মানকচু, পটোল প্রভৃতিতে। ভিটামিন সি দাঁত, হাড় ও মাড়ি গড়ে। পাওয়া যায় সমস্ত রকম লেবু, কলা, খেজুর, প্রভৃতিতে। ভিটামিন ডি দেহের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি করে। দুধ ও সূর্যতাপে পাওয়া যায়।

সুতরাং যাঁরা কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি খান তাঁরা দীর্ঘায়ু ও সুস্থ থাকেন। মুনি-ঋষি ও শতায়ু ব্যক্তিরা কাঁচা খাবারই খান বা কম খান।

(লেখক প্রকৃতিক চিকিৎসক)

FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

কে জিতবে বিশ্বকাপ?

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ধরে নিন, কৌন বনেগা ক্রোড়পতি অনুষ্ঠানে অমিতাভ বচ্চন প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছেন একজন কুইজারের কাছে। প্রশ্নটি শুনে তাঁর মুখের ভাবটি আন্দাজ করুন। বিশ্বের সবথেকে কঠিন জিগস পাজল- এর সামনে পড়লে মানুষের যে অবস্থা হয় তার থেকেও বোধহয় কঠিন অবস্থা হবে এই ভদ্রলোক অথবা ভদ্রমহিলার। একটি ইলেকশনে জিতবে কে, তা বলে দিতে পারেন সেফোলজিস্টরা। কিন্তু কখনোই কোনও ফুটবল বিশেষজ্ঞ বলতে পারেন না বিশ্বকাপ ফুটবলে কে চ্যাম্পিয়ন হবে? কেউ-কেউ ক্রিকেটকে বলেন, গেম অব গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটি। বিশ্বকাপ ফুটবলকে বলা যায়, এক সমুদ্র অনিশ্চয়তা। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির কাছে ব্রাজিল যে ৭-১ হারবে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? নাকি কেউ ভেবেছিল ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হবে এবং জিনেদিন জিদান নামে আলজেরিয়া থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা এক তরুণ গোটা বিশ্বকে পদানত করবে? আসলে বিশ্বকাপ ফুটবল হলো এমন একটা খেলার আসর যেখানে সব কিছুর আগে 'আনপ্রেডিক্টেবল' বিশেষণটি বসে। এই বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালের জন্য দু'টি দেশের মধ্যে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল তিনদিনের মেয়াদে। এই বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে ফকল্যান্ড যুদ্ধ অন্য মাত্রা পেয়েছিল, এই বিশ্বকাপ কোনও ফুটবলারের নামে চার্চ বানাতে উদ্যোগী করে সমর্থকদের, এই বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করেই চ্যাম্পিয়ন ফুটবলারকে কোনও শহরের মেয়রের পদে বসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিখ্যাত ফুটবল সাংবাদিক ব্রায়ান গ্লানভিল একবার লিখেছিলেন, একটি গ্রহের যাবতীয় বৈচিত্র্য একটি বিশ্বকাপে জোট বাঁধে। সত্যিই বৈচিত্র্য হলো বিশ্বকাপের অঙ্গ। এবারের বিশ্বকাপের কথাই ধরা যাক। তিনজন ফুটবলারের দিকে গোটা দুনিয়ার নজর নিবদ্ধ। লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং নেইমার। একজন আর্জেন্টিনার, একজন পর্তুগালের এবং শেষজন ব্রাজিলের। আর্জেন্টিনার কাপজয়ের স্বপ্ন মেসিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, নেইমারকে সামনে রেখে ব্রাজিল কাপ জেতার জন্য কোমর বাঁধছে। রোনাল্ডোর পর্তুগালকে কোনও বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত না করলেও, তাঁকে কেন্দ্র করে অসম্ভবকে সম্ভব করার বাসনা মনে লালন করছে পর্তুগালের বহু সমর্থক এবং বিশ্বের বহু মানুষ। একজন খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে এই বিপুল প্রত্যাশার জন্য বোধহয় বিশ্বকাপেই সম্ভব।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত, এবারের বিশ্বকাপে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা চারটি দেশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ব্রাজিল, জার্মানি, আর্জেন্টিনা এবং স্পেন। এর বাইরে দুটি দেশকে আমি ডার্ক হর্স বা কালো ঘোড়ার মর্যাদা দিতে চাই। এই দেশ দুটি হলো বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। এর বাইরে আর কারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তবে, আবার সেই রোনাল্ডোর কথা এসে যায়। অসম্ভবকে সম্ভব করার যার জুড়ি এই মুহূর্তে বিশ্বফুটবলে নেই। লিওনেল মেসি নিঃসন্দেহে বিশ্বের সেরা ফুটবলার। কিন্তু মনে রাখতে হবে মেসি তাঁর পাশে পাচ্ছেন আগুয়েরো, হিগুয়েন, দি মারিয়ার মতো ফুটবলারকে। রোনাল্ডো ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদে যে সাপোর্টটি পান তার ছিটেফোঁটা পান না জাতীয় দলে। সেই কারণে পর্তুগালের হয়ে বিশ্বকাপে তাঁর ট্র্যাক রেকর্ডটি এখনও ভালো নয়। সুতরাং রোনাল্ডোর একটা চেষ্টা থাকবে এই বিশ্বকাপে নিজেকে প্রমাণ করার। সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। সুতরাং তিনি এই স্লোগানটিতে বিশ্বাসী হতে পারেন, নাউ অর নেভার। একই অবস্থা মেসির। কারণ, তিনি এখনও বিশ্বকাপ জেতেননি। যাঁর সঙ্গে আর্জেন্টিনাইনরা তাঁর নামটি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন সেই ডিয়েগো মারাদোনার বিশ্বকাপ রেকর্ড অনেক ভালো। মেসি জানেন, তিনি যতই বিশ্বসেরা ফুটবলার হন, এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে কাপ জেতাতে না পারলে ইতিহাসের সরণিতে তিনি জায়গা পাবেন না। আর তাই, মেসির সেই আগ্রাসন এবার আর্জেন্টিনাকে কাপ জিততে সাহায্য করতে পারে। হয়তো কেন, নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এটা মেসিরও শেষ বিশ্বকাপ। সুতরাং তিনিও রোনাল্ডোর স্লোগানে বিশ্বাসী হতে পারেন। জার্মানি এবার টানা দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নামবে। গতবারের বিশ্বকাপজয়ী দলের অনেকে এবারের এই দলটিতে নেই। টমাস মুলার-ওজিলদের মোটিভেশনই হবে বিশ্বকাপ জয়। মুলার তো ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন কাপ জিতে লন্ডনে তিনি কুড়ি বোতল বিয়ার পান করে ডার্ট খেলবেন। ওজিল একজন ইউটিলিটি প্লেয়ার। সুতরাং তাঁর দিকে নজর থাকবে। এই খেলোয়াড়দের যেখানে বিশ্বকাপের দৌড় শেষ হচ্ছে, সেখানে নেইমার এক তরতাজা তরুণ। পায়ের পাতার চোট তাঁকে অনেক দিন প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের বাইরে রেখেছিল। এটি শাপে বর হচ্ছে ব্রাজিল দলের পক্ষে। একদম 'ফ্রেশ' হয়ে মাঠে নামবেন নেইমার তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিধর্মিতা নিয়ে। পিছনে আছেন অ্যালসন এবং এডারসন। ব্রাজিল দলটি যথেষ্ট শক্তি নিয়েই এবার লড়বে। স্পেন বিশ্বকাপের দৌড়ে আছে। যেমন আছে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামও। তবে, আবার সেই কৌন বনেগা ক্রোড়পতির টেবিলে ফিরে যাই। অমিতাভ বচ্চন প্রশ্ন করছেন, কে জিতবে বিশ্বকাপ? এবার উত্তরদাতা সটান উত্তর দিলেন, যেই জিতুক, আসলে জিতবে ফুটবল। ■

স্বপ্ন দেখাচ্ছে সুনীলের ভারত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ কোচ স্টিভন কনস্ট্যানটাইন বোধহয় ভারতীয় ফুটবলের জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক। সেই ২০০২ সালে তাঁর কোচিংয়ে বাইচুঙ ভুটিয়া, আই এম বিজয়ন, জো পল আনচেরির ভারত ভিয়েতনামে আসিয়ান দেশগুলিকে হারিয়ে এলজি কাপ জিতেছিল। আবার ১৬ বছর বাদে দেশের মাটিতে সেই একই কোচের তত্ত্বাবধানে ভারতের ট্রফি ক্যাবিনেটে জমা হলো ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ। মুম্বাইয়ের আন্ধেরী স্টেডিয়ামে ভারত চার ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি ম্যাচ হেরে দাপটের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশবাসীকে আবার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। সেই স্বপ্ন পরিণতি পাবে যদি ভারত আগামী বছর এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলতে গিয়ে মোটামুটি সম্মানজনক একটা অবস্থান ধরে রাখতে পারে। কারণ সেখানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে সুনীল ছেত্রী।

থাকা দেশগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তার প্রস্তুতির জন্য ভারত, কেনিয়া, নিউজিল্যান্ড ও চীনা তাইপেকে নিয়ে হয়ে যাওয়া ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ একটা দিকচিহ্ন তৈরি করতে পেরেছে।

গত ১৬ মাসে এশিয়ান কাপের কোয়ালিফাইং এবং ফিফা ফ্রেন্ডলি মিলিয়ে ১৬টি ম্যাচ অপরাজেয় ছিল ভারত। প্রথম হার স্বীকার সদ্যসমাপ্ত এই টুর্নামেন্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। নিউজিল্যান্ড এর আগে বিশ্বকাপ খেলেছে। তবে তারা পুরোশক্তির দল নিয়ে আসেনি। অন্যদিকে ফাইনালে আগেই চলে যাওয়ায় নিয়মরক্ষার ম্যাচ বলে ভারত তেমন গা লাগিয়ে খেলেনি। দু-তিনজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ স্টিভন। তাই সব মিলিয়ে বলা চলে এই টুর্নামেন্টে ভারত যা খেলেছে তা অনেকদিন পর তৃপ্তির খোরাক এনে দিয়েছে। অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে অসাধারণ পারফরমেন্স মেলে ধরেছেন প্রতিটি ম্যাচে। ৮টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও 'ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট' হয়েছেন। বস্তুত সুনীল এখন এশিয় পর্যায়ে রীতিমতো সম্ভ্রমের পাত্র। বিদেশে লিগ খেলার অভিজ্ঞতা তাকে অনেক পরিশীলিত করেছে। ১০২ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৬৪ টি গোল করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, বলরাম, হাবিব, ইন্দার সিংহ, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, কৃশানু দে, সাবির আলি, বাইচুঙ, বিজয়নের মতো আন্তর্জাতিক তারকা বিদেশে সফল ফুটবলারদের রেকর্ড ভেঙে যেভাবে এগিয়ে চলেছেন তা বিস্ময়কর।

এই ভারতীয় দলে প্রতিটি পজিশনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ফুটবলার আছে যেটা আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। কয়েকবছর আগে আরেক ব্রিটিশ কোচ বব হাউটনের সময় ভারত বেশ কিছু টুর্নামেন্টে পরপর সাফল্য পেয়েও বৃহৎ পরীক্ষা মঞ্চ এশিয়াকাপে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কারণ তখন বাইচুঙ, সুনীল, সুব্রত পাল, মহেশ গাউলি এরকম কয়েকজন উঁচুমানের খেলোয়াড় ছিল দলে কিন্তু বাকিরা ছিল অতি সাধারণ। আর রক্ষণ, মাঝমাঠ, আক্রমণ এই তিন বিভাগের মধ্যে সুষম সমন্বয় ছিল না। বর্তমান টিমে গোলকিপার গুরুপ্রীত সিংহ সান্ধুকে ঘিরে তৈরি হয় যাবতীয় আক্রমণ। সান্ধু নরওয়ের সুপার ডিভিশন ক্লাবে খেলেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলেন এই মরসুমে। ডিপ ডিফেন্সে সন্দেশ জিঙ্গন অতি নির্ভরযোগ্য। গোটা ডিপ ডিফেন্সকে জমাটবন্ধ করে আক্রমণে যাওয়ার প্রবণতা তাকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। তার পাশে প্রীতম কোটাল, আনাস এডিয়ো ডিকারা যথাযথ মানানসই হয়ে উঠে ডিফেন্সকে নির্ভরতা দিচ্ছেন।

আধুনিক উন্নত ফুটবলের মেরুদণ্ড মাঝমাঠ। যে কোনও দলের খেলায় যাবতীয় ভুলত্রুটি ঢেকে যায় যদি তার মাঝমাঠ সুবিন্যস্ত থাকে। এই জায়গায় প্রণয় হালদার, অনিরুদ্ধ থাপা সেই ৮০-র দশকের শক্তিশালী ভারতীয় মাঝমাঠকে মনে করাচ্ছে। যে সময় প্রসূন, প্রশান্ত ব্যানার্জি, পারমিন্দার সিংহকে নিয়ে গড়া মাঝমাঠ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাফল্য এনে দিয়েছিল ভারতের। প্রণয় হালদারের খেলার স্টাইল অনেকটা প্রসূনের মতো। এই মাঝমাঠ যদি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে তবে এশিয়াকাপেও ভারত কিছু করে দেখাতে পারে। আর আক্রমণভাগে সুনীল তো একাই একশো। সুনীল-জে জে কম্বিনেশন মুম্বইয়ের মাঠে যেভাবে ঝলসে উঠে কেনিয়া, চিনা তাইপেকে জমি ধরিয়ে দিয়েছে আক্রমণের ঝড় তুলে তা দেখে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ধারণা বদলাবে এ এফ সির। গত তিন-চার বছরে অসম্ভব উন্নতি করেছেন স্ট্রাইকার জে জে। পাশে সুনীলকে পেয়ে আরও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছেন। কোচ স্টিভন তার স্ট্রাটেজি, ট্যাকটিক্সের অদল-বদল ঘটিয়ে টিমকে প্রেসিং এবং পজেশনাল খেলিয়ে ঠিক কাজের কাজটি করে দিয়েছেন। ■

খালি পায়ের খেলোয়াড় তাই খেলা হলো না মান্নার

অনুপম দাশগুপ্ত

ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের শুরু ১৯৫০ সালে। বিস্তার মোটামুটি দুই দশক। এই পর্বে আমরা ভারতের জাতীয় দলের বর্ণময় উত্থান দেখেছি। আজকের ভারতীয় ফুটবল দেখে বোঝার উপায় নেই সে সময় আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে এশীয় ফুটবল মানচিত্রে ভারত কতটা সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। আরও একটা বিষয় অনেকে জানেন না বা জানলেও বিস্মৃত হয়েছেন, ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলার সুযোগ পেয়েও কেন ভারত যায়নি।

সুযোগ এসেছিল অদ্ভুতভাবে। সেবার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপের তিন প্রতিপক্ষই নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ভারতের সামনে অভাবনীয় সুযোগ এসে যায়। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এ আই এফ এফ) সিদ্ধান্ত নেয় ভারত বিশ্বকাপে খেলবে না। না-খেলার পিছনে ফেডারেশনের প্রধান যুক্তি ছিল এইরকম : ভারতীয় খেলোয়াড়রা খালি পেয়ে খেলতে অভ্যস্ত। তাই ভারতীয় খেলোয়াড়রা ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার বুট-পরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পেরে উঠবে না। বিশ্রীভাবে মার খাবে এবং ১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিকে অর্জিত সুনাম ভূলুণ্ঠিত হবে। সদ্য স্বাধীন দেশে পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রার অভাব এবং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ধকল সামলানোর ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ছিল দ্বিতীয় কারণ। সেই সময় ভারতে ৭০ মিনিটের ফুটবল ম্যাচ খেলা হতো। ওদিকে বিশ্বকাপের সব ম্যাচই ৯০ মিনিটের। এ আই এফ এফ যুক্তি দেখিয়েছিল বাড়তি ২০ মিনিট খেলা ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এইসব যুক্তিতে সারবত্তা কতটা ছিল সে প্রসঙ্গ পরে। বিশ্বকাপের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে ফেডারেশনের অজ্ঞতা কোন পর্যায়ের ছিল সেটা আগে দেখা দরকার। শুরু থেকেই বিশ্বকাপ ফুটবল শুধুমাত্র পেশাদার ফুটবলারদের জন্য। এদিকে অলিম্পিক এবং এশিয়াডে তখন কেবলমাত্র অপেশাদার ফুটবলাররাই অংশ নিতে পারতেন। ফেডারেশন কর্তারা ধরে নিয়েছিলেন বিশ্বকাপে খেললে ভারতের খেলোয়াড়রা আর অপেশাদার থাকবেন না। অলিম্পিক এবং এশিয়াডের দরজা ভারতের জন্য চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বকাপের বয়েস তখন মাত্র কুড়ি বছর। তার ধারভার কিছুই এখনকার মতো ছিল না। তুলনায় অলিম্পিক এবং এশিয়াড ছিল অভিজাত। ফেডারেশনের কর্তারা বিশ্বকাপের জন্য অলিম্পিক এবং এশিয়াড হাতছাড়া করতে চাননি। যদিও তাদের আশঙ্কা ছিল নিতান্তই অমূলক। বিশ্ব ফুটবল

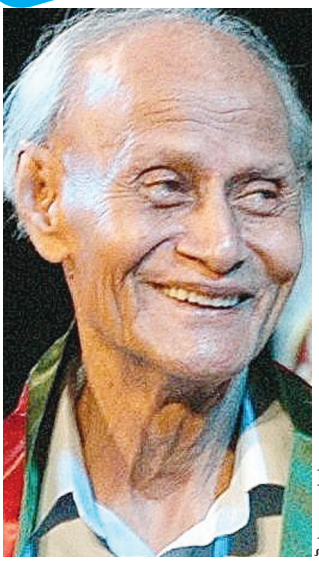

শৈলেন মান্না

সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই ছিল তাদের বিশ্বকাপে না খেলার কারণ। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির একাধিক খেলোয়াড় পেশাদার না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বকাপে খেলেছেন। অলিম্পিকে অংশ নিতেও তাদের অসুবিধে হয়নি। উদাহরণ হাঙ্গেরির পুসকাস, বজসিক, হিদেকুটি সোভিয়েত ইউনিয়নের লেভ ইয়াসিন, নেটো।

খালি পায়ে খেলার ব্যাপারেও ফেডারেশন কর্তারা বাড়াবাড়ি করেছিলেন। সে সময় ভারতের কোনও ফুটবলারই বুট পরে খেলতেন না, কথাটা ঠিক নয়। হায়দরাবাদ এবং মহীশূরের কয়েকজন ফুটবলার দিব্যি খেলতেন। ১৯৫০ বিশ্বকাপের দলগঠনে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারত। একথা ঠিক, সেই সময়ের তারকা খেলোয়াড়েরা খালি পায়ে খেলতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। উদাহরণ আমেদ খান, এম. এ. সাত্তার, এস রমন এবং শৈলেন মান্না। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা শেষ হবার মোটামুটি এক বছর পর মূল বিশ্বকাপ শুরু হয়। চাইলে ফেডারেশন কর্তারা এই সময়টায় খালি পায়ের খেলোয়াড়দের বুট পরে খেলায় স্বচ্ছন্দ করে তুলতে পারতেন। এবং তা করাও যেত। তা না করে তারা খেলতে যাবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। খালি পায়ের অজুহাতে বঞ্চিত করলেন শৈলেন মান্নাদের। বঞ্চিত হলো ভারতও।

এই ঘটনা ফুটবলের সর্বময় অধিকর্তা ফিফা ভালোভাবে নেয়নি। ১৯৫৪ সালে ভারত যখন বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলার জন্য আবেদন করে, ফিফা তা নাকচ করে দেয়। শুধু সেই বছরই নয়, পরের প্রায় আড়াই দশক ধরে এই শীতলযুদ্ধ চলতে থাকে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও চুণী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জি, তুলসীদাস বলরাম জার্নেল সিংহ অরুণ ঘোষ প্রমুখ বিশ্বকাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। অশোক ঘোষ ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্ব নেবার পর বরফ গলতে শুরু করে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারত খেলার সুযোগ পায়। তারপর থেকে প্রতিবারই ভারত সুযোগ পেয়ে আসছে।

অনেকেই মনে করেন ১৯৫০ বিশ্বকাপে না খেলার খেসারত ভারত আজও দিয়ে চলেছে। ভুললে চলবে না ওই বছরেই এশিয়াডে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরে আবার চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৬২ সালে। মাঝখানে ১৯৫৬-র অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ। সুতরাং ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে ভারত খেললে উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে আসতে পারত। পরে সেই ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেন স্বর্ণযুগের ফুটবলাররা।

একটা সুযোগ কত দরজা খুলে দেয়। আমাদের জন্যেও দরজা খুলেছিল কিন্তু আমরা সাহস করে ভেতরে যেতে পারিনি। ■

১৯৫৬ অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী ভারতীয় দল।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীতজ্ঞান

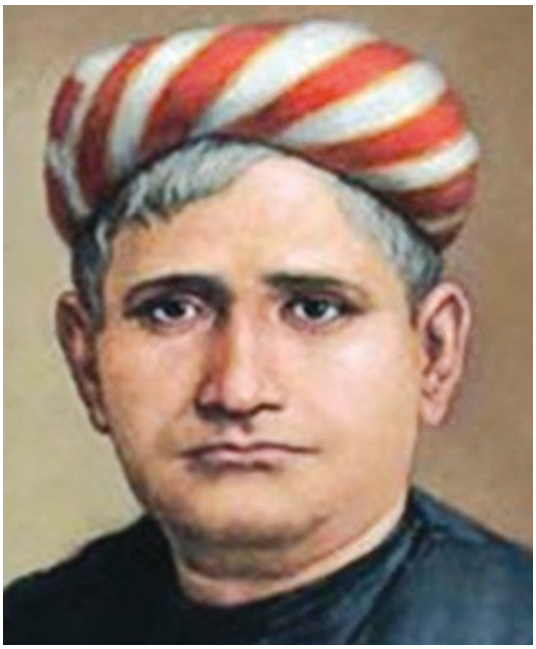

তপন মল্লিক চৌধুরী

গভীর রাত্রে জগৎসিংহের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে গড় মান্দরণ থেকে শৈলেশ্বর মন্দিরে চলেছেন বিমলা, সঙ্গে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। রূপসী বিমলাকে ওই রাত্রে মুগ্ধ করতে বিগলিত দিগ্‌গজ গান গাইতে শুরু করে— 'সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে/কদম্বেরি ডালে। /সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—/ কালি দিলাম কুলে'। এই গানের সূত্র ধরে সংগীতনিপুণা বিমলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গেয়ে উঠলে বিদ্যাদিগ্‌গজের আর গান গাওয়া হয় না, কারণ সে 'বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনী' শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। গান শেষ হলে সে বিমলাকে একটি বাংলা গান গাইবার অনুরোধ করে।

নিজের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতের এমনই এক সুন্দর আবহ রচনা করেছিলেন— সেকালে প্রচলিত কায়স্থ কমলাকান্তের রূপ। অভিসারের পদ 'কি ক্ষণে শ্যামাচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল' অথবা বেলডাঙার রূপচাঁদ অধিকারীর ঢপকীর্তন 'কি রূপ দেখিনু কদম্বমূলে/কলিন্দ নন্দিনীর কূলে' ইত্যাদি বাংলা গানের আদলে বঙ্কিম যে গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন তা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের পক্ষে যেমন খুবই মানানসই ছিল তেমনই বঙ্কিমের সংগীতপ্রিতিসহ তার গান রচনার দক্ষতাও স্পষ্ট হয়।

গীতিকার হিসাবে বঙ্কিমের সম্যক পরিচয় মেলে 'মৃণালিণী' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে মোট বারোটি গান আছে, এর মধ্যে মাত্র দুটি গান উপন্যাসের নায়িকা 'মৃণালিনী' উপন্যাসে প্রথম আবির্ভূত হন প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে। গিরিজায়া আসলে ভিখারিণী বেশে দূতী। গিরিজায়া প্রথম গান গায়; একদিকে কানু ও রাই, অন্যদিকে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী। গিরিজায়া গেয়ে চলে, 'মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনি-রে। /কহ লো নাগরি, গেহ পরিহারি, কাঁহে বিবাসিনি-রে'।। গিরিজায়ার কণ্ঠে এই গান শুনে মৃণালিনীর এতই ভালোলাগে যে সে দ্বিতীয়বার গিরিজায়াকে গানটি গাইবার অনুরোধ করে। দ্বিতীয়বার গান শেষ হলে মৃণালিনী গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি গীত সকল কোথায় পাও?' গিরিজায়া জানায়, 'যেখানে যা পাই তাই শিখি'। গিরিজায়া মারফত বঙ্কিম আমাদের ফের জানিয়ে দেন যে হাটে-মাঠে-বাটে গান গেয়ে ফেরা বৈষ্ণব- বৈষ্ণবীরা চিরকালই বাংলার সেরা গান সংগ্রাহক। লক্ষণীয় এই গানের ভাষা; ব্রজবুলি ভাষাতে এই গানের রচয়িতা বঙ্কিম 'মৃণালিনী' উপন্যাসে তিনি ওই ভাষাতে কেবল একটি নয় আরও বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন। প্রসঙ্গত বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ আট বছরের বালক। তার মানে ভানুসিংহ নন, বঙ্কিমই ব্রজবুলি ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে নতুনভাবে ব্যবহার করার অগ্রপথিক। গানটির ফুটনোটে আছে 'এই গীত ঢিমে তেতালা তাল যোগে জয়জয়ন্তি রাগিণীতে গেয়'।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে একের পর এক গান এসেছে নানা অনুসঙ্গে। 'যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।/ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,/পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে'।। গিরিজায়ার কণ্ঠে এ গানে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর পরিচয়, অনুরাগ ও শেষে আকস্মিক বিচ্ছেদের কথাই যেন ফুটে উঠছে। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত আরেকখানি গান, 'ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ। / কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ'।। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত গিরিজায়ার গাওয়া এই গানও যে মৃণাল হারা হেমচন্দ্রের উদভ্রান্ত দশার কথা বলেছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সংগীতপ্রেমী বঙ্কিম বাংলার নিজস্ব ধ্রপদী সংগীত কীর্তনের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সেই আগ্রহ থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন বৈষ্ণব গীতিপদ, তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল বহু কীর্তন গান। Calcutta Review পত্রিকায় ১৮৭১ সালের ১০৪ সংখ্যায় 'Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধেও তিনি বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী সংগীত কীর্তন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমের সংগীতপ্রীতি কেবল কীর্তন গান নয়, তিনি বাউল গানেরও একজন মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব ভাষাশৈলীতে যেমন কীর্তনাঙ্গের গাম বেঁধেছেন পাশাপাশি 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে'র মতো যে গান রচনা করেছেন তাতে লালন বিরচিত 'চাতক স্বভাব না হলে...' কিংবা লালন শিষ্য গোঁসাই গোপালের 'না জেনে অকূল পাথারে ভাসালাম তরী' ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'মৃণালিনী' ছাড়াও কীর্তনের আসর বসতে দেখা যায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে, সপ্তম পরিচ্ছেদে, এখানে আসর অনেক বেশি জমজমাট। 'কথা কইতে যে পেলাম না— দাদা বলাই সঙ্গে ছিল— কথা কইতে যে' তুলসীর মালা পরা, কপালে তিলক কাটা বৈরাগীর দলকে মৃদঙ্গ বাজিয়ে নগেন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়িতে যেমন গাইতে দেখি, তেমনই বৈষ্ণবীদেরও রসকলি কেটে খঞ্জনির তালে গাইতে দেখা যায় 'মাধো কানের কি...' এরপর নবম পরিচ্ছেদে শোরগোল তুলে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে আবির্ভূত হয় হরিদাসী বোষ্টমী। হরিদাসী ভেকধারী, জাল বোষ্টমী, আসলে দেবেন্দ্র দত্ত নগেন্দ্রর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য ছদ্মবেশী ধারণ করেছিল। গিরিজায়ার মতো সে নয় কিন্তু তার ঝুলিতে বঙ্কিম ভরে রাখেন আঠারো শতকের শেষপাদ ও ঊনিশ শতকের বাংলা গানের নমুনা। এক এক করে হরিদাসী পেশ করে সেই সব গান। কুন্দনন্দিনীর উদ্দেশে হরিদাসী প্রথমে কীর্তন, 'শ্রীমুখপঙ্কজ— দেখবো বলে হে,/তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।/ আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে'। এরপর ঢপ, 'আয়রে চাঁদের কণা/ তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পড়তে দিব সোনা'। এরপর দেবেন্দ্র বা হরিদাসী আরও প্রগলভ হয়ে ওঠে, 'কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,/গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল'। জাল বোষ্টমী চরিত্র বোঝাতে বঙ্কিম উচ্চাঙ্গের কীর্তন যেমন রেখেছে তেমনই হাজির করেছেন বাগানবাড়ির গান, গোপাল উড়ের টপ্পার ধাঁচে লঘু গান ইত্যাদি।

ভারতীয় মার্গসংগীত থেকে কীর্তনাঙ্গের গান; এমনকী বাংলা লঘু বা চটুল গান বঙ্কিমের উপন্যাসে পরিপূর্ণভাবেই আছে, সব গান যে তারই রচনা এমনটা কিন্তু নয়। অনেক গানে আবার অন্য গানের সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কোনো গানের সংগ্রাহক বঙ্কিম নিজে। নিজের লেখা গানে বঙ্কিম তো কেবল রচয়িতা নন, রাগ-তালের যথাযথ উল্লেখ বলে দেয় সংগীত সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা কতখানি গভীর। 'মৃণালিনী' 'বিষবৃক্ষ'র মতো সংখ্যায় বেশি না হলেও গান রয়েছে 'ইন্দিরা'তেও। 'একা কাঁখে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি,/ জলের ভিতরে শ্যামরায়'। এই প্রাচীন গীত ইন্দিরার মনে পড়ে নৌকো চড়ে গঙ্গা দিয়ে কলকাতা যাওয়ার সময়। পাঠকমাত্রই সাহিত্য সম্রাটের সংগীত প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে 'বন্দে মাতরম্' গানটির কথা মনে আসে। যে গান ভারতের জাতীয়তার মহামন্ত্র। গানটি বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' উপন্যাস লেখার অন্তত ছ-সাত বছর আগে লিখেছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। ফুটনোটে আছে মল্লার রাগ ও কাওয়ালি তালে গানটি গীত। শোনা যায় বঙ্কিমের সংগীতগুরু যদুভট্ট গানটিতে প্রথম সুরারোপ করেছিলেন কিন্তু কোনও রাগ বা তালে বা জানা যায় না। বন্দে মাতরম্ ছাড়াও 'আনন্দমঠ'-এ আরও গান আছে, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাগীশ্বরী রাগিনীতে আড়া তালে শান্তিকে গাইতে দেখি, 'দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে...পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না'। তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শান্তি ও তাঁর স্বামীর যুগলকণ্ঠে পাই, 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?/ হরে মুরারে; হরে মুরারে'। এছাড়াও ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ও শান্তির গলায় বঙ্কিম রেখেছেন জয়দেব গোস্বামী বিরচিত পদ— 'ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী...' তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে শান্তি গায় গোস্বামী কবির দশাবতার স্তোত্র, 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম...'

উপন্যাস, ছাড়াও বঙ্কিমের গান পাওয়া যায় 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ কমলাকান্ত প্রসন্নকে শুনিয়েছিলেন, 'এসো এসো বধূ এস, আধ আচারে বসো...'। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ধনকুবের জগৎশেঠ ভাইদের জলসাঘরের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সংগীতসভায় মনিয়াবাঈকে 'সনদি খিয়াল' গাইতে দেখা যায়, 'শিখো হো ছল ভালা'। অমুমান মেটিয়াব্রুজে ওয়াজেদ আলি শাহ-র সভাগায়ক সনদপিয়া রচিত ঠুমরি হলো সনদি খিয়াল। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছদে মোগল সেনার বেশে মানিকলালের গলায় বঙ্কিম রাখেন উত্তর-মধ্য ভারতের লোকভাষার একটি গান, 'শরম ভরমসে পিয়ারী,/সোমরত বংশীধারী, / ঝুরত লোচনসে বারি...' এরকম উদাহরণ আরও রয়েছে বঙ্কিমের উপন্যাসে এবং লেখায়। বঙ্কিমের এই সংগীতপ্রীতি এবং সংগীত বিষয়ে গভীর ধারণা কোথা থেকে কীভাবে হয়েছিল?

আমরা জানি বঙ্কিমের সময় হলো বাংলায় রাগ সংগীত চর্চার সুবর্ণ যুগ। একদিকে মেটিয়াব্রুজে লখনউয়ের সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর সংগীত দরবার, যার স্পষ্ট প্রভাব বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বর্ণিত নবাব কতুল খাঁর নাচগান বিলাসিতার মধ্যে অনেকখানি ধরা পড়ে, অন্যদিকে পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ও শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের গানবাজনার আসর, এছাড়াও কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি-সহ কয়েকটি বনেদি বাড়ির সংগীত চর্চা ও বৈঠকি আড্ডা কলকাতার সেই সময়কার সংগীত চর্চাকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত বঙ্কিম ছিলেন শৌরিন্দ্রমোহনের খুবই ঘনিষ্ঠ, তাঁদের বাগানবাড়ি মরকতকুঞ্জেদ ১৮৭৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক কলেজ রি-ইউনিয়নে শৌরিন্দ্রমোহনের গান শুনতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতেও গৃহদেবতা রাধাবল্লভের নানা পার্বণ উপলক্ষেও যাত্রা, পালাগান, কথকতা ইত্যাদি লেগেই থাকত। শৈশবাবস্থা থেকেই বঙ্কিম ওই সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় তার কান গানের জন্য যে তৈরি হয়ে উঠেছিল তা বলাই যায়। পরবর্তীকালে একটু বেশি বয়সে তিনি রীতিমতো নাড়া বেঁধে তাঁর থেকে দু'বছরের ছোট সেই সময়ের প্রখ্যাত ধ্রুপদশিল্পী যদুভট্টের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন।

শোনা যায় শৈশবকাল থেকেই বঙ্কিম মুখে মুখে গান রচনা এবং তাতে সুর সংযোগ করতেন। বঙ্কিমের ভাইয়ের ছেলে তথা বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন, 'মৃণালিনী' লেখার সময় বঙ্কিম ইতিহাস ও বিজ্ঞান পড়তে যেমন শুরু করেছিলেন তেমনই গান শেখার ঝোঁক দেখা যায়। কাঁঠালপাড়ারই একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক যদুভট্টকে পঞ্চাশ টাকা বেতন দিয়ে তিরিশ উত্তীর্ণ বঙ্কিম গান শেখা শুরু করেন। বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯-এর ১৯ নভেম্বর, তার আগে ব্যক্তিগত কাজে তিনি ছ'মাসের ছুটি নিয়েছিলেন ১৮৬৮-র ৪ জুন থেকে। এরপর ১৮৬৮-র শেষাশেষি তিনি 'মৃণালিনী' লিখতে শুরু করেন। শচীশচন্দ্রের জীবনী অনুযায়ী এই সময়েতেই তিনি যদুভট্টের কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলাই যায় বঙ্কিমের সংগীত চর্চা খুব নিয়মিত হয়নি। কারণ ১৮৬৯-এর ১৫ ডিসেম্বর তিনি বহরমপুরে কাজে যোগদান করেন। ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকেই বঙ্কিম সপ্তাহান্তে কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে ফিরতেন, তাঁর বাড়িতেই বসত 'বঙ্গদর্শন'-এর বিখ্যাত মজলিশ, সেখানে উপস্থিত থাকতেন যদুভট্টও।

এই সময়

ডিজিটাল ভারত

ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার মাধ্যমে আপনারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পে উপকৃত মানুষের জমায়েতে সম্প্রতি একথা বলেন নরেন্দ্র মোদী। উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তি জানান, গত ৩ বছরে তিনি ১৫টি কম্পিউটার পেয়েছেন। তার গ্রামের সবাই এখন ইন্টারনেটে স্বচ্ছন্দ।

গিলগিট বালটিস্তানে

কোনও পরিষেবা না দিয়েই পাক সরকার গিলগিট বালটিস্তান থেকে মোটা টাকা কর

আদায় করে। এই অভিযোগে সম্প্রতি গিলগিট- বালটিস্তানের মানুষ পাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলেন। খাপলু স্কারদুর মতো কয়েকটি জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ পালিত হয়।

নিহত আওরঙ্গজেব

লেফটেন্যান্ট উমর ফৈয়াজের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। তাঁকে হত্যা করে জঙ্গিরা। একই

কায়দায় সেনা জওয়ান আওরঙ্গজেবকে অপহরণ করে হত্যা করেছে জিহাদিরা। কাশ্মীরে এখন রমজানের জন্য সংঘর্ষ বিরতি চলছে। অথচ খুন হলেন একজন মুসলমান।

সমাবেশ -সমাচার

হৃদয়পুর ও বালুরঘাটে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিক্ষা বর্গ

অখিল ভারতীয় হিন্দু মহিলা সংগঠন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ বর্গ এবছর আয়োজন করা হয় প্রদেশের দুটি স্থানে। একটি উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে এবং অন্যটি দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হৃদয়পুর প্রণব কন্যা সঙ্ঘের আশ্রমে। হৃদয়পুরে দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষা বর্গ অনুষ্ঠিত হয় ১৯ মে থেকে ৩ জুন। দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষা বর্গে প্রবেশ ও প্রবোধ দুটি বর্ষের একত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ৯৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণবর্গের ১৩টি জেলা থেকে জেলাভিত্তিক উপস্থিতি : কলকাতা-৮, হাওড়া-৩, হুগলী-৬, পুরুলিয়া-১, মুর্শিদাবাদ-১, পূর্ববর্ধমান-১, বাঁকুড়া-২, বীরভূম-১, পূর্ব মেদিনীপুর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর-৫, নদীয়া-১৯, উত্তর ২৪ পরগনা-২৩ এবং দক্ষিণ ২৪

হৃদয়পুর

পরগনা-২৫ জন। বর্গাধিকারী ছিলেন শ্রীমতী রমা বিশ্বাস, বর্গ কার্যবাহিকা— শ্রীমতী অঞ্জনা রায় এবং বর্গের সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী ঋতা মণ্ডল। বর্গে শিক্ষিকা ছিলেন ৫ জন। দক্ষিণবঙ্গের এই শিক্ষা বর্গ পরিদর্শনে আসেন সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তা আক্কাজী। এছাড়াও আসেন প্রমুখ সহ কার্যবাহিকা চিত্রা তাঈ যোশী, অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা তাঈ হলদেকর, পূর্বোত্তর ও পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ সুপর্ণা দে এবং অসম প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ পোখিলা বোরো। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ সুনীলা সোবনী। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রণবকন্যা সঙ্ঘের সহ সম্পাদিকা সন্ন্যাসিনী আত্মস্থানন্দময়ী মা। উপস্থিত ছিলেন সমিতির পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের শিক্ষা বর্গ গত ২৪ মে থেকে ৮ জুন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সম্পন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলা থেকে ৬৮ জন সেবিকা অংশগ্রহণ করেন। গত ৮ জুন শিবিরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কার্যবাহিকা শ্রীমতী অন্নদানম সীতা, অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ শ্রীমতী সন্ধ্যা তিপরে, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

বালুরঘাট

এই সময়

আইনের হাত

ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করল ইডি। অভিযোগ,

তিনি মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ২০১২ সালে তিনি কালোটাকা সাদা করতে সাহায্য করেন। কালো টাকার পরিমাণ ৩,৬৩৩ কোটি। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭ জন।

গুলবাজ

কিছুদিন আগে হার্দিক প্যাটেল বলেছিলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি শীঘ্রই

পদত্যাগ করবেন। নতুন কোনও পতিদার নেতা মুখ্যমন্ত্রী হবেন। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মিডিয়ার লাইমলাইটে আসার জন্য হার্দিক মাঝে মাঝেই এরকম গুল দেন। এনিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

প্রমীলা কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ বাহিনীতে লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য কেন্দ্র আরও দুই

ব্যাটেলিয়ন মহিলা পুলিশ বাহিনী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে পারিবারিক হিংসার শিকার মহিলারাও উপকৃত হবেন। জম্মু ও কাশ্মীরে আলাদা আলাদা ব্যাটেলিয়ন দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

সমাবেশ -সমাচার

রায়গঞ্জে দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ৯ জুন রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের দ্বিতীয় বর্ষ এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথমবর্ষের ২০ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ পৌরসভার অবসর প্রাপ্ত সুপারভাইজার বিশিষ্ট সমাজসেবী বংশী বাসফোর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পূর্বক্ষেত্র

প্রচারক প্রদীপ যোশী। এছাড়া উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা ও অন্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সেদিনই দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উপার্জনশীলদের সাধারণ প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য সনাতন মাহাত।

কলকাতায় আরোগ্য ভারতীর আয়ুর্বেদ সম্মেলন

গত ২৭ মে কলকাতায় হাজরার একল ভবনে আরোগ্য ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে ভারতীয় স্বাস্থ্য চিন্তন আয়ামের 'আয়ুর্বেদ ও সুস্থজীবনশৈলী' বিষয়ক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রান্ত সচিব ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে বিষয় উপস্থাপনা করেন জামনগরের গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চকর্ম বিভাগের বিভাগীয়

প্রধান ও আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় 'স্বস্থ গ্রাম' প্রমুখ ডাঃ হিতেশ জানি, আয়ুষ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের পরামর্শদাতা ও আরোগ্য ভারতীর অখিল ভারতীয় বনৌষধি প্রচার প্রসার প্রমুখ ডাঃ রাকেশ পণ্ডিত এবং আরোগ্য ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বনৌষধি

এই সময়

ছত্তিশগড়ে মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছত্তিশগড়ে ইনটিগ্রেটেড কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের

উদ্বোধন করলেন। এই সেন্টার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণের একটি অঙ্গ। এছাড়া জগদলপুর এবং রায়পুরের মধ্যে চালু হলো বিমান পরিষেবা। অনুষ্ঠানে মোদী সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

সপাটে

রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিযোগ, জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে বলা হয়েছে

'আজাদ কাশ্মীর'। এই বিকৃতি নিয়ে মুখ খুলেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মতে রিপোর্টটি সম্পূর্ণ 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। আজাদ কাশ্মীর বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

পুরোহিতের বিরুদ্ধে

তিরুপতি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এ.ভি. রাসান্না দিক্ষিটুলুকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল

তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম বোর্ড। কিছুদিন আগে বোর্ডের কর্তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনেছিলেন। উল্লেখ্য, সুব্রহ্মনিয়াম স্বামীও তার অপসারণের দাবি করে আদালতে মামলা করেছেন।

সমাবেশ -সমাচার

প্রচার প্রসার প্রমুখ কাঁকিনাড়া আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যাপক ড. শৈলেন্দ্র সিংহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংগঠনের অধ্যক্ষ তাপস সরকার। অনুষ্ঠানে ডাঃ হিতেশ জানি জিন, জেনেটিক্স ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে আলোচনায় দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করে বলেন যে, প্রাচীন ভারতের জীবনশৈলীর অন্তর্গত গর্ভসংস্কার পদ্ধতি সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আজও আমরা চাইলে ঋষিপ্রতিম সন্তান লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রহ্লাদমাতা কয়াধু, শিবাজীমাতা জীজাবাই, স্বামীজীমাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কথা উল্লেখ করেন। বনৌষধি ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার বিষয়ক আলোচনায় ডাঃ রাকেশ পণ্ডিত কিচেন হসপিটাল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বাড়ির আশপাশ ও ছাদে হার্বাল গার্ডেন করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। সুস্থ জীবনশৈলী বিষয়ক আলোচনায় ডাঃ শৈলেন্দ্র সিংহ 'আহার-বিহার- দিনচর্যা-ঋতুচর্যা' সম্বন্ধে সচেতনতার মাধ্যমে সুস্থ ও নীরোগ জীবনযাপন করে আর্থিক অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। শ্রীমতী অঞ্জলি ব্যানার্জী ও সৌরভ পরাশর যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের আবাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ বর্গ

প্রতি বছরের মতো এবছরও সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গের আবাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ বর্গ হালিশহরে নিগমানন্দ আশ্রমে গত ১০ জুন সমাপ্ত হয়। এটি ছিল একাদশ বর্ষ।

শতাধিক শিক্ষার্থী এতে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই স্নাতক। এছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন এম.বি.বি.এস, ডিগ্রি কলেজের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান শিক্ষার্থীরূপে ছিলেন। এঁরা সকলেই সংস্কৃতের প্রচার প্রসারে পরবর্তী জীবনে কাজ করার ইচ্ছাতেই বর্গে এসেছেন।

শিক্ষার্থীরা একদিন সকলে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে শহরের কিছু অংশ পরিক্রমা করেন। 'সংস্কৃতভাষা আমাদের ভাষা', 'গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংস্কৃতম্' ইত্যাদি নির্ঘোষ পথিপার্শ্বস্থ দর্শকদের আকৃষ্ট করে। গত ৯ জুন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. স্মৃতিকুমার সরকার। তাঁর ভাষণে সংস্কৃত সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় সবাই প্রভূত উপকৃত হয়। বিশেষ অতিথির ভাষণে সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী দিনেশ কামাত শিক্ষার্থীদের দেশের সংস্কৃতি রক্ষায় সংস্কৃত প্রচারের কার্যে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালে চল্লিশজন তাঁদের জীবনের কিছু সময় সংস্কৃতের জন্য সমর্পণ করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করেন।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

কাশীর পণ্ডিত গাগাভট্ট একদিন শিবাজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রায়গড় এলেন। শিবাজীর সঙ্গে গাগাভট্টর দীর্ঘদিনের পরিচয়। তিনি মারাঠা ব্রাহ্মণ হলেও কাশীতেই বসবাস করতেন। আওরঙ্গজেবের দ্বারা কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস, হিন্দু মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার গাগাভট্ট নিজের চোখে দেখেছেন। ঠিক সেই সময় রায়গড়ে পরাক্রমী, প্রজানুরঞ্জক, ন্যায় নীতিপরায়ণ শিবাজী মহারাজ 'হিন্দবী স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। রায়গড়ের সুশাসন দেখে গাগাভট্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে রাজন্, আপনি এতো সম্পদের অধিকারী, শক্তিশালী কল্যাণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু রাজ্যের সিংহাসন কোথায়? এই মহৎ সংস্কারের জন্য আপনার সিংহাসন, ছত্র, চামর ইত্যাদি সার্বভৌম চিহ্ন ধারণ করে রাজ্যাভিষেক করে নেওয়া দরকার।' 'রাজ্যাভিষেক? মহারাজের রাজ্যাভিষেক?' সভাসদরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'আমাদের রাজা ছত্রপতি, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজাধিরাজ হবেন, কী আনন্দের কথা!' স্বয়ং শিবাজী মহারাজ শান্তভাবে বসে রয়েছেন, তাঁর মনে কোনও আনন্দের ভাব ফুটে উঠল না। কয়েকদিন পর শিবাজী তাঁর রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং তাদের সামনে রাজ্যাভিষেক সম্পর্কে বললেন। সকলেই আনন্দে নিজ নিজ সম্মতি জানালেন। স্বভাবতই শিবাজী পণ্ডিত গাগাভট্টের প্রস্তাবমতো রাজ্যাভিষেকের জন্য রাজি হলেন।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের কথা সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল। সকলেই খুব খুশি। মা জিজাবাঈয়ের আনন্দ আর ধরে না। গাগাভট্টের ক্লান্ত শরীরে নবচেতনার সঞ্চার হলো। রায়গড় হলো গড়ের রাজা। এর নাম ছিল 'রায়রী', শিবাজী নাম দিয়েছেন রায়গড়। দুর্গটি কোংকন উপকূলে অবস্থিত। সমুদ্রতট থেকে ৯৫০ গজ উঁচুতে। লম্বা দু' ক্রোশ। চওড়া তুলনামূলক ভাবে কম। দুর্গের প্রবেশদ্বার তিনটি। রাস্তা এত দুর্গম ও জটিল যে মরতে চায় এমন ব্যক্তিও তা দেখে মরার ভয়ে পালিয়ে যেত। রায়গড়, প্রতাপগড়, সিন্ধুদুর্গ-সহ আরও ২০টি দুর্গ শিবাজী শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করেছিলেন।

রায়গড়ে রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। শিবাজীরাজের জন্মপত্রিকা দেখে শুভ মুহূর্ত ঠিক করেছেন পণ্ডিত গাগাভট্ট। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী, ইংরেজি ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন সকাল ৫টায়। রাজ্যাভিষেকের আর ১৫ দিন বাকি। শিবাজী প্রতাপগড়ে গেলেন ভবানী মায়ের মন্দিরে। নিজ মস্তকে ছত্র ধারণ করার আগে দেবী ভবানীকে সওয়া মন ওজনের সোনার ছাতা অর্পণ করলেন। দেবী ভবানী তো তাঁর সব কিছু। তাঁর হৃদয়, তাঁর মস্তক, নেত্র, হাত সব কিছুর মধ্যে মা ভবানীর অধিষ্ঠান। তিনিই তাকে সব সময় প্রেরণা ও যশ প্রদান করেছেন।

রাজসভায় উঁচু বেদীর উপর সিংহাসন রাখা হলো। বত্রিশ মন সোনা ও নবরত্ন দিয়ে সিংহাসনটি তৈরি করেছেন রামাজী দত্রে। তাঁর মধ্যে অঙ্কিত ছিল বহু শুভচিহ্ন। সভাগৃহের মধ্যে ছয় হাজার লোক সহজে বসতে পারে। প্রবেশদ্বার এমন উঁচু ছিল যে হাতি খুব সহজে ভেতরে ঢুকতে পারে। দরজার দু'পাশে খুব সুন্দর দুটি পদ্মফুল এবং বাঘের চিত্র খোদাই করা ছিল। এসব ছিল হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতীক। রাজসভার দুদিকে নবহতখানা। সিংহাসনে

বসার আগে পর্যন্ত শিঙ্গা, কর্ণ, সানাই বাজত। সিংহাসনের কাছে বসে সাধারণ গলায় কেউ কিছু বললে সারা সভাগৃহে তা ভালোভাবে শোনা যেত। রাজসভার পশ্চিমদিকে মহল, বিচারসভা, অষ্ট প্রধানের কার্যালয়। রাজমহলের উপর তিনটি মিনার খুবই সুন্দর কারুকার্যখচিত। সুবর্ণ সিংহাসনে বসে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হবে। রাজ্যাভিষেক ক্ষণে রাজ্যজুড়ে মঙ্গল ধ্বনি বাজতে লাগলো। সমারোহের জন্য রায়গড়ে নিমন্ত্রিত ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিক, কবি, শিল্পী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয় স্বজনদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। শিবাজী ছিলেন খালিস ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। সেই আচার বিধি অনুসারে পণ্ডিত গাগাভট্ট রাজ্যাভিষেকের সবকিছু প্রস্তুতি করেছেন। সোনার চৌকির উপর শিবাজীর পাশে যুবরাজ সম্ভাজী ও পরিবারের সকলে এসে বসলেন। অন্যদের হাতে কলস। বেদমন্ত্র উচ্চারণ আরম্ভ হলো। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতি সপ্ত নদীর জল মহারাজা, মহারানি ও যুবরাজের মাথার উপর বর্ষিত হতে লাগলো। সর্বত্র মহারাজের জয়ধ্বনি উৎঘোষিত হলো।

রাজ্যাভিষেকের এই শুভ মুহূর্তে শিবাজীর মনে হতে লাগল তান্তাজী মালুসরকে। মনে হতে লাগল প্রতাপরাও গুজর, মুরার বাজী, বাজী পাসলকর, বীর যোদ্ধার মুখ, হাজার হাজার যুবক যাঁরা এই হিন্দু সাম্রাজ্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, তার বিনিময়ে আজ এই সিংহাসন। মহারাজের মস্তক নত হলো।

মহারাজের মাথায় অভিষেক বারিধারা বর্ষিত হয়ে চলেছে। অভিষেকের পর মহারাজা মহারানি এবং যুবরাজ বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করলেন। রাজ্যাভিষেকের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। মহারাজের বাম হাতে সোনার বিষ্ণুমূর্তি, ডান হাতে ধনুষ, কোমরে মা ভবানীর তলোয়ার। সমস্ত দেবদেবীকে প্রণাম করে, কুলগুরুর চরণধূলি নিয়ে মাতা জিজাবাঈয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। মহারাজ-সহ সকলে মায়ের চরণে প্রণাম করলেন। মায়ের চোখের সামনে তখন ছোট্টবেলাকার শিবাজী। শিবনেরির মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলা লাফাতে লাফাতে খেলতে খেলতে বড় হওয়ার দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। শিবাজী আজ ছত্রপতি মহারাজ হয়েছে। মায়ের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত। জিজাবাঈ তাঁর চোখের সামনে মোগলদের দ্বারা ধর্মস্থল অপবিত্র ও মা-বোনেদের কলঙ্কিত হতে দেখেছেন। সেদিন তিনি মা ভবানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পুত্রকে দিয়ে এর প্রতিকার করাবেন। সেদিন তিনি স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজ তাঁর স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে।

মাতৃ বন্দনা শেষে শিবাজী মহারাজ রাজসভার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। সভায় তিলধারণেরও স্থান নেই। রাজ পরিষদ-সহ শিবাজী রাজসভায় প্রবেশ করে বেদীর কাছে এসে পৌঁছলেন। ভূমির উপর ডান হাঁটু মুড়ে বসে সিংহাসনকে বন্দনা করলেন। অষ্টপ্রধানরা নিজ নিজ স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুভ মুহূর্তটি দর্শনের জন্য সকলের চোখ তখন সিংহাসনের দিকে। গাগাভট্ট এবং অন্য পণ্ডিতরা উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করে চলেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত উপস্থিত হতে চলেছে। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী শনিবার, সকাল ৫টায় মহারাজ সিংহাসনে উপবেশন করলেন। মহারাজের মাথার উপর ছত্র ধারণ করে গাগাভট্ট ঘোষণা করলেন— 'মহারাজ সিংহাসনাধীশ্বর ক্ষত্রিয় কুলবৎস রাজা শিবাজী মহারাজ ছত্রপতি কী জয়।' তিনবার তোপধ্বনি হলো। নহবত, সানাই, শিঙ্গা, কর্ণ সব এক সঙ্গে বেজে উঠল। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'রাজা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কী জয়।' ফুল চন্দন, সুগন্ধী বর্ষিত হতে লাগল। রাজ্যের সমস্ত দুর্গে ঠিক একই মুহূর্তে একসঙ্গে তোপধ্বনি হলো, মহারাজের জয়গান ঘোষণা হলো। আর সেই তোপধ্বনি দিল্লির সুলতানের হৃদ্‌কম্প ধরালো। মোগল সম্রাটের ঘুম ভেঙে গেল।

প্রসন্ন চিত্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে চন্দন কুমকুম ও পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে ১৬ জন কুমারী-সহ মায়েরা বরণ করলেন এবং তিলক এঁকে দিলেন। অন্য মহিলারা বলতে লাগলেন, 'রাজা হয়েছেন শিবরাজ এখন আমাদের ভয় কীসের?' প্রধানমন্ত্রী মোরপন্ত ৮ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা দিয়ে মহারাজকে অভিষেক করালেন। সবাই উপহার দিতে লাগলেন। সিংহাসনের পাশে উপহারের পাহাড় জমতে লাগল। উপহার পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর সকলে নিজ নিজ আসনে বসলেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের এটাই প্রথম দরবার।

রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হতে চার ঘণ্টা লাগল। মহারাজের শোভাযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সুসজ্জিত সাদা হাতির উপর মহারাজ বসলেন। পেছনে প্রধানমন্ত্রী মোরপন্ত, সামনে প্রধান সেনাপতি হাতিস্বররাও মোহিত। সামনে পেছনে রাজচিহ্ন এবং পতাকা। মহারাজের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। হাতির সামনে পেছনে এক হাজার সৈনিক। নিজ নিজ পদ্ধতিতে অষ্টপ্রধান ও অন্য পদাধিকারীরা চলেছেন। একেবারে সামনে রাজ নহবত বাজছে। সবশেষে মহারাজের ঘোড়সওয়ার বাহিনী। বাদ্যযন্ত্র এবং জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। সুসজ্জিত তোরণ-শোভিত রাজপথ দিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। যেন সমস্ত মহারাষ্ট্র রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে শিবাজী মহারাজের জয় ঘোষণা করছে। শোভাযাত্রা শেষ হলো। শিবাজী মহারাজের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ে প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিজাপুর রাজ্যের সামান্য জায়গিরদার শাহজী ভোঁসলের পুত্র শিবাজী (১৬১৭-১৬৮০)। তিনি প্রথমে দক্ষিণে বিজাপুরের মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করে হিন্দু সাম্রাজ্য দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত করেন। নিজস্ব শাসনাধীন অঞ্চল ছাড়াও তিনি মোগল ও বিজাপুরের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী নামে দুটি কর সংগ্রহ করতেন। শিবাজীর সাম্রাজ্যের শক্তির মূল উৎস ছিল বিভিন্ন মারাঠা সেনাপতিদের নিয়ে গঠিত মারাঠা রাজ্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, 'শিবাজী পরমাণুর মতো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে একটি শক্তিমান জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তিনিই আধুনিক আত্মসচেতন হিন্দু জাতির পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভের দীক্ষাদাতা'।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় সংগঠক)

(হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব অর্থাৎ শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ প্রবন্ধ)

প্রাচীন রাজবংশ

কলচুরি (চেদি)

গোপাল চক্রবর্তী

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে কলচুরিগণ চন্দ্রবংশীয় যযাতির পৌত্র সহস্রার্জুনের পৌত্র হৈহয়ের বংশধর। এটি মধ্য ভারতের এক প্রাচীন রাজবংশ। এই পৌরাণিক রাজবংশ কালে কালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। প্রাচীন শিলালিপিতে হৈহয়, চেদি, কলচুরি, কটচুরি, কলৎসুরী, কুলচুরি প্রভৃতি নামেও এই রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বংশের অন্যতম নৃপতি শিশুপাল (চেদিরাজ) কৃষ্ণের বিরোধী এবং কুরুপতি দুর্যোধনের অন্যতম মিত্র ছিলেন। এই বংশের আদি বাসস্থান নর্মদা উপত্যকা অঞ্চল। প্রাচীন রাজধানী ছিল মাহিষনতী বা মান্ধাতা। অবন্তিও কলচুরি রাজ্যভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কলচুরি রাজ্য দক্ষিণে নাসিক, পশ্চিমে গুজরাট উপদ্বীপ ও পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ডের বৃহৎ অঞ্চল সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কলচুরিগণ মধ্যনর্মদা উপত্যকায় রাজ্য স্থাপন করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশ ও পরে উত্তরাংশে গুর্জরপ্রতিহারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কলচুরিদের রাজ্য ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। কলচুরিগণ অতঃপর পূর্বদিকে মধ্যপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। বিভিন্ন অঞ্চলে কলচুরিবংশের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণে কল্যাণীর কলচুরি বংশ এইরূপ এক শাখা। উত্তর ভারতে কলচুরিগণের মধ্যে গোরক্ষপুর, মালব, তুম্মান বা রত্নপুর এবং দাহল (ত্রিপুরী) বা চেদির কুলচুরি বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নর্মদাতটস্থ দাহনের কলচুরি বংশ প্রায় তিনশত বছর রাজত্ব করে। এই বংশের প্রথম রাজা কোক্কল্ল বা কোক্কলের আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৭০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ। কোক্কলের পুত্র শঙ্করগণের সময় কলচুরি রাজ্যের রাজধানী হয় ত্রিপুরী (বর্তমানে জব্বলপুরের নিকটস্থ তেওয়ার গ্রাম)। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য রাজা গাঙ্গেয়দেব (১০০৮ খ্রিঃ) অঙ্গ, কীর, কুন্তল, উৎকল ইত্যাদি দেশের রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন। তিনি নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণ (১০৪১-৭৩ খ্রিঃ) কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। চালুক্যরাজ ভীমের সহযোগিতায় ইনি ভোজরাজ পরমারকে পরাস্ত করেন। রাজ্য বিস্তারের জন্য পাণ্ড্য, মুরল, বঙ্গ, গুর্জর, হূণ, কীর ও চন্দেল্লদের পরাভূত করে মগধ আক্রমণ করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তিনি মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

পরবর্তী রাজাগণের মধ্যে যশঃকর্ণ, গয়াকর্ণ, নরসিংহ, জয়সিংহ বিজয় সিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহের আক্রমণে, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও মুসলমান আক্রমণের ফলে দাহলের কলচুরি রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে লুপ্ত হয়।

অনেক পৌরাণিক নগর ও রাজবংশের মতো কলচুরিদের অস্তিত্বও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং এদের শাখা প্রশাখাও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোক্কলের অন্যতম পুত্র কলিঙ্গরাজ দক্ষিণ কোশলের (বর্তমান ছত্তিশগড় রাজ্য) তুম্মানে (বিলাসপুর জেলাস্থ তুমনা গ্রাম) একটি পৃথকরাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশটি রত্নপুরের (অধুনা বিলাসপুর জেলার রতনপুর গ্রাম) কলচুরি বংশ নামেও খ্যাত। লক্ষ্মীকর্ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত তুম্মান বা রত্নপুরের কলচুরিগণ দাহলের কলচুরি বংশের অধীন ছিল। সম্ভবত রাজা পৃথ্বীদেবের সময় তুম্মানের কলচুরিগণ স্বাধীন হয়। ছত্তিশগড় অঞ্চলে এই কলচুরি বংশ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করে। কলচুরিগণ একটি নতুন অব্দ প্রচলন করে। এর আরম্ভ ২৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তীকালে মুসলমান আগ্রাসনের ফলে কলচুরিদের নগর ও স্বাত্যন্ত্র বিলুপ্ত হয়। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

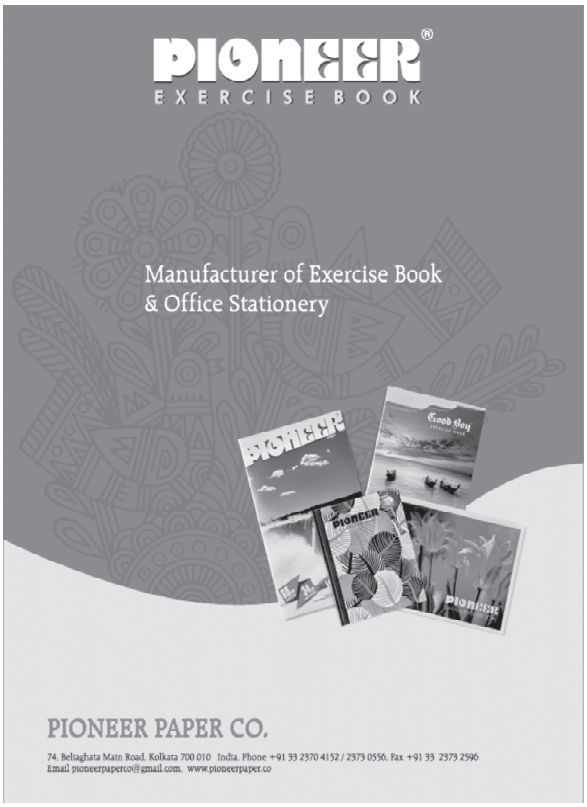

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

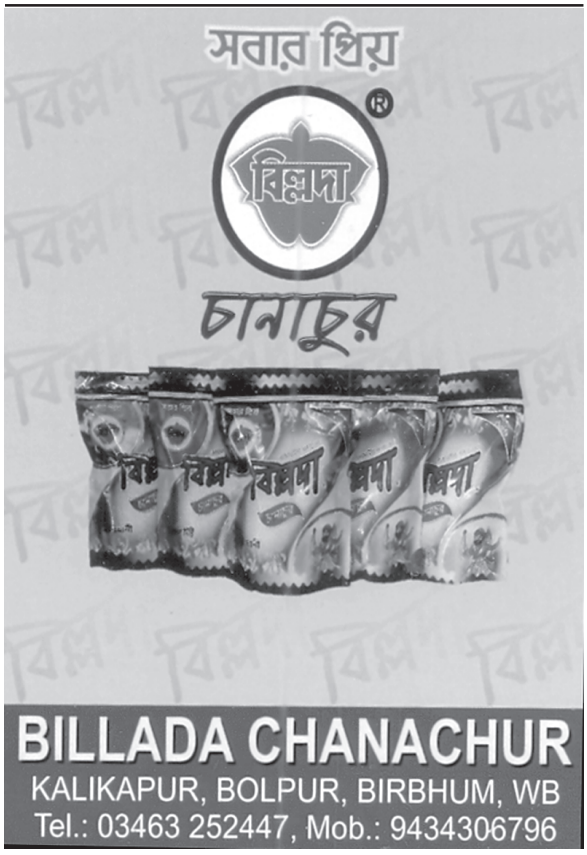

জন্মজন্মান্তর

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগলে যথারীতি একই দৃশ্য। পাশে আমার ১২ বছরের ছেলে মড়ার মতো পড়ে আছে, আর আমার স্ত্রী দীপ্তি জানালার ধারে চেয়ারে বসে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে।

গত তিন মাস যাবৎ প্রতিদিন সকালে এহেন গতানুগতিক নির্বাক নাটকের পুনরাভিনয় চলছে। দেখে দেখে আমি ক্লান্ত, রিক্ত, হতাশ হয়ে গেছি। বাস্তবিক, চোখ খুললেই আমার মনে হয়, রোজ রোজ কত-শত মানুষ তো অসুখে-বিসুখে-দুর্ঘটনায়-আত্মহত্যায় ফটাফট মরে যায়, নিমতলার শ্মশানের চুল্লি বস্তুত একদিনও খালি যায় না, অথচ আমরা কেন মরছি না।

কিন্তু এর উত্তর কে দেবে? ঈশ্বর তো কবেই মরে গেছে। আর কোনও মানুষ— সে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন-শুভাকাঙ্ক্ষী— যেই হোক না কেন, আমাদের ভবিতব্য সম্বন্ধে শেষকথা বলার ক্ষমতা কারুরই নেই।

এই যে আমাদের ছেলে মুকুট তিনমাস ধরে অজানা রোগে ভুগছে, ওর আরোগ্য কবে হবে? আদৌ হবে কি! কেউ বলতে পারে না। কত যে ছোট বড় ডাক্তার— অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি দেখালাম, কেউ কিছু করতে পারল না। সকলেই শুধু আশ্বাস দেয়, ভালো হয়ে যাবে। অথচ ছেলে আর সুস্থ হয় না। উঠে বসতেই পারে না। কথা বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। কিছু খেতেও চায় না। রাত বাড়লে জ্বর আসে, ভোরবেলা ছেড়ে যায়। দিনের পর দিন কেমন রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে। হাত-পা-ও আর ঠিকমতো নাড়াতে পারে না।... সেই যে একদিন বিকেলে ফুটবল খেলে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল, আর উঠতে পারল না।

আমি মাসদুয়েক অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই বসে আছি। দীপ্তি বলছে, স্কুলের চাকরিটা ও ছেড়ে দেবে। কী হবে চাকরি করে!...সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের আর ঘরের বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করে না। ৩/৪ দিন অন্তর বাজারে যাই, হাতের সামনে যা পাই, কিনে আনি। খাওয়া-দাওয়ায় তো রুচিই নেই, কাজের লোক বাসন্তী সিদ্ধ-ভাত করে মুখের সামনে ধরে দেয়, কোনোক্রমে মুখে দিই অথবা নাড়াচাড়া করে উঠে যাই। কিছুই আর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে আমরা ফোন করে এ-ডাক্তার, ও-ডাক্তার, এ-জ্যোতিষী, সে-তান্ত্রিককে (বলা বাহুল্য, জ্যোতিষী আর তান্ত্রিকের প্রতি দীপ্তির অগাধ বিশ্বাস বা দুর্বলতা আছে) বাড়িতে ডাকি। তারা এসে একগাদা মিথ্যে কথা বলে, একরাশ টাকা নিয়ে চলে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না। কী করব, কিছুই আর বুঝতে পারি না। কেবলই মনে হয়, ঘুমের ট্যাবলেট বেশি মাত্রায় খেয়ে তিনজনেই শুয়ে পড়ি। হয়তো আর কিছুদিন পরেই বদ্ধ পাগল হয়ে যাব আমরা। দীপ্তি তো এখনই আপনমনে বিড়বিড় করে কী সব বলে। হঠাৎ হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে, আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে দ্বিতীয় দফায় চা খাচ্ছি, এমন সময় ডোরবেল বাজল। বাসন্তী দরজা খুলল। একজন সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ লোক ফ্ল্যাটে ঢুকল। বয়স আমারই মতো— ৪৪/৪৫। চিনতে পারলাম। ও হলো অবিনাশ, আমার কলেজের বন্ধু। আগে এই ফ্ল্যাটে অনেকবার এসেছে। একত্রে খাওয়া-শোওয়া— আড্ডা, কত কীই করেছি। অবিনাশ বলল, কী রে, কী খবর? চিনতে পারছিস?

আমি হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে আছি। প্রায় পাঁচ বছর পরে দেখা। ও তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। এখন ওকে একদম রোগা আর কালো দেখাচ্ছে। চুলগুলোও সাদা হয়ে গেছে।... অবিনাশ এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলো। আমি সহসা ওকে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেছি। কিছু বলার আগেই ও বলল, তুই কি কোনও সমস্যায় পড়েছিস?

আমি চট করে কিছু বলতে পারলাম না। ও আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। আচমকা দুদ্দাড় করে ড্রয়িং রুমে এল দীপ্তি। এসেই অবিনাশকে দেখে বলল, অবিনাশদা আপনি!... অবিনাশদা, আমার ছেলে বোধহয় আর বাঁচবে না। আমরাও আর বাঁচতে চাই না।

অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। বলল, ছেলে কোন ঘরে আছে?

দীপ্তির সঙ্গে অবিনাশ পাশের ঘরে চলে গেল। আমি বসেই রয়েছি। যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। অবিনাশ বিয়ে করেনি। আহিরীটোলায় এঁদো গলিতে একটা পুরনো ভাঙাচোরা একতলা বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকত। ছোট্ট বাড়িতে মাত্র দু-খানা ঘর। শ্যাওলা ধরা উঠোন, এক কোণে নিমগাছ। ওর বাড়িতে গেলেই মাসিমা বলতেন, আমার এই পাগল ভবঘুরে ছেলেটাকে একটু দেখো বাবা। ও-তো বিয়েও করল না, কাজকর্মও তেমন কিছু করে না। কে যে ওকে দেখবে! —বলতে বলতে মাসিমা একদিন দুপুরবেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকে চলে গেলেন। তার পর থেকে অবিনাশ একাই থাকত। মাঝে মাঝে বেড়ানোর বিষম বাতিক ছিল ওর। হঠাৎ-হঠাৎ দিনকয়েকের জন্য কোথায় কোথায় যেন চলে যেত। ফিরে এসে রোমাঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিত। এই কারণে ওর কোনও স্থায়ী চাকরি বা প্রেমও হলো না।... কলেজ স্ট্রিটে কোনও প্রকাশালয়ে বইয়ের প্রুফ দেখত, এডিট করত। বই ঘাড়ে করে বিক্রিও করে বেড়াত।... আমার বিয়ের পর থেকে মাঝে মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা হতো। কারণ আমি তখন কর্মসূত্রে এবং সংসারে আবদ্ধ হয়ে গেছি আর অবিনাশেরও আমার বাড়িতে আসা কমে গিয়েছিল। তবু ওর সঙ্গে কখনও দেখা হলে বেশ ফুরফুরে লাগত। বস্তুত দারুণ জমিয়ে গল্প বলার অভ্যাস মজ্জাগত ওর, রসবোধও যথাবিহিত। উপরন্তু বন্ধুত্বেও আন্তরিক। —এইভাবেই দিনগুলো কাটছিল। এর পর বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ও আমার অজ্ঞাতসারে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অবরে-সবরে ওর বাড়িতে গিয়ে দেখতাম, মেইন গেটে তালা বন্ধ। আশেপাশের লোকজনও কোনও খবরাখবর দিতে পারত না। আর ও তো মোবাইলও ব্যবহার করত না, এমনই অদ্ভুত। তখন ওর কথা মনে পড়লে প্রাণটা খাঁ খাঁ করত। জীবনে কত বন্ধুই তো এসেছে এবং গেছে, অথচ ওর সঙ্গে যেমন মনের মিল, তেমন আর কারুর সঙ্গে হলো না।

দীপ্তির সঙ্গেই ড্রয়িং রুমে ফিরল অবিনাশ। বাসন্তী চা-বিস্কুটের কাপ-প্লেট রেখে গেল টেবিলে। অবিনাশ চেয়ারে বসলো। আমার মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই হেসে বলল, ভয় নেই, ছেলে ভালো হয়ে যাবে।... তবে আমি যা বলব, করতে হবে।

দীপ্তি ধপাস করে ওর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। আমার চোখে রঙিন আলো জ্বলে উঠল। অবিনাশ কী করতে পারবে, আমি জানি না। কিন্তু ওকে দেখেই যেন অনেকদিন পরে আমার শরীরে-মনে বল-ভরসা-আশার সঞ্চার হলো। আমি ওর বাঁ হাতটা শক্ত করে ধরলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে অবিনাশ বলল, কাল রাত্রে তুই আমার বাড়িতে চলে আয়। পরশু ভোরে আমরা এক জায়গায় যাব। তার পরদিন ফিরে আসব।

দীপ্তি অধীর হয়ে বলল, আমার ছেলে সুস্থ হয়ে গেলে আপনি যা

চাইবেন, আমি তাই-ই দেব।

অবিনাশ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, কিছু পেতে গেলে কিছু তো দিতেই হয়।

আমি বললাম, অবিনাশ তুই কেমন আছিস? কেন তুই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলি! কোথায় গিয়েছিলি?

রাত্রে তরকা আর রুটি খেয়ে অবিনাশের পাশে তক্তাপোশে শুয়ে আছি। ধুলোমাখা ঘরে ৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে। এখন মার্চ চলছে, সামান্য গরম পড়েছে। মাথার দিকে পুরনো টেবিলফ্যান শব্দ করে ঘুরছে। আমার আর কোনও ভয় নেই, পাশে যে অবিনাশ রয়েছে।

অবিনাশ কথা বলছে, আমি শুনছি।

...আমার এই কলকাতা, এই একঘেয়ে জীবন আর ভালো লাগছিল না। বারেবারেই মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন চলে যাই। মনটা কেবলই ছটফট করছিল। কে যেন ক্ষণেক্ষণেই ডাকছিল আমাকে— আয় আয়— চলে আয়—

আমার মা-র অনেক গয়না ছিল— সোনার। কিছু রুপোর বাসনকোসনও ছিল। আর ছিল ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা কিছু টাকা। নমিনি আমার নামে। আমি একদিন সব টাকা তুলে ফেললাম। গয়নাগুলো আর বাসনকোসন বড়বাজারে গিয়ে বেচে দিলাম। তার পর বেরিয়ে পড়লাম একদিন— কত জায়গায় ঘুরলাম— বেনারস, হরিদ্বার, মথুরা-বৃন্দাবন, অরুণাচল, অসম থেকে কাশ্মীর হয়ে আবার গেলাম কেদারনাথ-বদ্রীনাথ হয়ে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত। কখনো ট্রেনে, কখনো বাসে, কখনো বা হেঁটেও ঘুরেছি। কত সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশলাম, যা কলকাতায় থাকলে সম্ভব হতোই না। ক্রমে আমার অন্তরশক্তি জাগ্রত হলো। উপলব্ধি করলাম, প্রাকৃতিক শক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মহাবিশ্বকে আর কোয়ান্টাম শক্তি চালনা করে আণবিক জগৎকে।... আশ্চর্য, আমি অনুভব করলাম, আমি আশেপাশের লোকজনের এবং দূরের পরিচিতদের মনের কথা টের পাচ্ছি। কাছে ও দূরে কোথায় কী হচ্ছে, কী ঘটছে, জানতে পারছি।... একদিন হরিদ্বারে জ্যোৎস্নারাতে এক সাধুর ডেরায় শুয়ে কেন কে জানে, তোর কথা মনে পড়ল। দেখলাম, তোর ছেলে অসুস্থ। তার ৯০ শতাংশ জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গেছে। আর ১০ ভাগ মাত্র প্রাণশক্তি অবশিষ্ট রয়েছে। মাত্র তিন মাস— আর তিন মাস পরেই তার আয়ু শেষ হয়ে যাবে।... দেখলাম, তোরা স্বামী-স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে রাস্তার নর্দমার জল তুলে খাচ্ছিস। আমি বিচলিত হলাম। আর স্থির থাকতে না পেরে ফিরে এলাম কলকাতায়। এসেই তোর সঙ্গে দেখা করলাম।... শোন, তোর ছেলেকে 'ক্রিয়া' করা হয়েছে। তোর ছেলের কোনও বন্ধুর দাদা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। তার শিয়রে শমন এসে গেছে। সেই বন্ধুর বাবা কোনও তান্ত্রিকের পরামর্শে এই ক্রিয়া করেছে। তোর ছেলেকে কৌশলে একরকম 'রাসায়নিক যৌগ' খাইয়েছে। এবার তোর ছেলের মৃত্যু আর ওই অসুস্থ ছেলেটা ক্রমশ আরোগ্য লাভ করবে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। তোর ছেলেকে যেমন করেই হোক, আমি বাঁচাবই। তবে একটা কথা বলতে চাই, তুই যেমন তোর মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেকে ফিরে পাবি, তেমনই তোকে কিছু হারাতেও হবে। কী হারাবি তা আমি এখন জানি না। আমি শুধু চেষ্টা করব, তোর ক্ষতিটা যেন ন্যূনতম হয়।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব কী বলছে অবিনাশ! ও এখন কোন জগতের লোক! ও কি কলেজে ছাত্র-রাজনীতি করা বামপন্থী মার্কসবাদী অবিনাশ, নাকি অন্য কেউ! আমার পাশে এ কে শুয়ে আছে? নাকি আমারই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

ভোরবেলা কলকাতা স্টেশন থেকে হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস ধরে বেলায় বহরমপুরে নেমেছি। নেমে বাসস্ট্যান্ডে এসে জলঙ্গির বাসে চড়েছি। বাসস্ট্যান্ডেই ভরপেট জলযোগ সেরে নিয়েছি। এখন জলঙ্গিতে নেমে এই দুপুরে চড়া রোদ মাথায় নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে চলেছি। সঙ্গে অবিনাশ। রাস্তা তো নয়, মাঠ-ঘাট, বনবাদাড়, জমির আলপথ ধরে শুধু হাঁটছি তো হাঁটছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। অবিনাশ জানে, যদিও মুখ বন্ধ রেখেছে।

কোনও এক সময় আমরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। নির্জন, নিস্তব্ধ প্রকৃতি, দিগ্‌বিদিকে কোথাও লোকালয় নেই। মনে হলো, এটা শ্মশান। চারপাশে ছোট ছোট মাঠ বা তৃণভূমি, বনবাদাড়-ঝোপঝাড় আর বড় একটা পুকুর। সামনে সমতল মাঠ— বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল, ছাতিম আর বকুলগাছে ঘেরা। মাঠে দড়িদড়া, বাঁশ, পোড়া কাঠ, খই, মাটির ভাঙা কলসি, ছেঁড়া মাদুর-চাদর, ফাটা বালিশ ইতস্তত পড়ে আছে। ডান দিকে দু-তিন দিনের পুরনো একটা চিতা— ছাইমাখা কাঠগুলো চতুষ্কোণ আকারে এখনও রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে পাখপাখালি চোখে পড়ছে না। এমনকী, কুকুর বা গোরু-ছাগলও অদৃশ্য।

আমরা তেঁতুল গাছের তলায় বসলাম। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে জল খেলাম। খানিকক্ষণ থম্ মেরে বসে থাকলাম। অবিনাশ সামনের দিকে গভীর অভিনিবেশে তাকিয়ে আছে। এইভাবেই কতক্ষণ কেটে গেল। অবিনাশের নির্দেশে মোবাইল বন্ধ রেখেছি। এবার তার অনুমতি নিয়ে মোবাইল খুলে টাইম দেখলাম। সাড়ে চারটে বাজে। আবার মোবাইল বন্ধ করলাম। মন অবশ হয়ে গেছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর অবিনাশ নিজের ব্যাগ খুলে একে একে টর্চ, ধুনুচি, ছোবড়া, দেশলাই, কয়েকটা কাগজের পুরিয়া আর কী সব যেন বের করল। আমি বুঝতেই পারছি না, ও কী করবে?

ক্রমে সূর্যাস্ত হলো। চরাচর অস্পষ্ট হয়ে এল। এখন গাছগাছালিতে পাখিরা উঠে আসছে। পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ার দমকে গাছপালা দুলছে শব্দ করে। পাতা খসে পড়ছে। আমাকে উঠতে ইশারা করল অবিনাশ। দুজনে উঠে পুকুরের ধারে গেলাম। জলে নেমে হাত-পা-মুখ ধুলাম। ফিরে এসে পুরিয়া থেকে লাল আবির বের করে তেঁতুলগাছের তলায় একটা আয়তকার গণ্ডি কাটলো অবিনাশ। বলল, তুই সারারাত এখানেই বসে থাকবি। এই গণ্ডির বাইরে গেলে তোকে আমি বাঁচাতে পারব না।

আমার গা ছমছম করে উঠল। আমার গণ্ডি কাটার পর অবিনাশ আবির আর সাদা সরষে দিয়ে চিতার চারদিকে নিজের জন্য গণ্ডি কেটে দিল। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ। অবিনাশ আমাকে গণ্ডির মধ্যে বসতে বলে, তার সরঞ্জাম নিয়ে চিতার ওপর বসে পড়ল। টর্চ জ্বালিয়ে পুরিয়াগুলো খুলে কী সব বের করল! ধুনুচিতে ছোবড়া রেখে আগুন ধরালো। তারপর ধুনুচি সামনে বসিয়ে, টর্চ গণ্ডির বাইরে রেখে দিল।

আমি চুপচাপ বসে আছি। মন পড়ে আছে ছেলের দিকে। ইতস্তত ঝিঁঝি ডাকছে। জোনাকিরা উড়ছে। কানের গোড়ায় মশা বিনবিন

করছে। মাঝে মাঝে কামড়াচ্ছেও। এলোপাথারি হাওয়ার দাপটে মনে হচ্ছে, হয়তো উড়ে যাব।... আমার মুখোমুখি ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যান করছে অবিনাশ।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, অনুমান করলাম। আকাশে নিটোল চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আজ কি পূর্ণিমা! এতক্ষণ চাঁদ বোধহয় মেঘের আড়ালে ছিল। এখন চরাচর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। শ্মশানের টপোগ্রাফি আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।... হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখি, লম্বায় বেশ কয়েক ফুট, সাদা, মোটা একটা সাপ সড়সড় করে চিতা প্রদক্ষিণ করছে। সামান্য তফাতে একটা বড় কালো বেড়াল অবিনাশের দিকে মাথা তুলে চেয়ে আছে। আর অবিনাশ মাটি থেকে প্রায় ৩/৪ ফুট শূন্যে উঠে গিয়ে, বসে রয়েছে স্থির ভঙ্গিতে।

আমি বিষম ভয় পেলাম। প্রায় সসেমিরা অবস্থায় অবিনাশকে কী যেন বলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঠোঁট নড়লেও কথা বেরুল না।

সহসা যে গণ্ডির মধ্যে বসে আছি, সেই ভূখণ্ড দুলতে শুরু করল। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? আমি কাঠ হয়ে বসে রয়েছি।... দুলতে দুলতে অকস্মাৎ ধীর গতিতে ঘুরতে লাগল গণ্ডি দেওয়া ভূমি। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেললাম। এসব কী হচ্ছে! চোখ বুজতেই মনে হলো, আমি পড়ে যাচ্ছি, পাহাড় থেকে কোনও খাদে। পড়ছি তো পড়ছি— আমার চিন্তার স্রোত তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে হলো, মাতৃজঠরে পৌঁছে গেছি। চারদিক অন্ধকার জলমগ্ন, আমি জলে ভেসে আছি। পরক্ষণেই দেখলাম, আমি মহাকাশে উড়ছি। উড়তে উড়তে দেখছি, পৃথিবী বনবন করে ঘুরছে। আশেপাশে একের পর এক ব্ল্যাকহোল। এ কী! মৃতপ্রায় নক্ষত্র প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে যাচ্ছে, আগুনের গোলার মতো হয়ে যাচ্ছে— তার সমস্ত পদার্থ ছড়িয়ে পড়ছে মহাকাশে।... আমি একটা ব্ল্যাকহোলে ঢুকে গেলাম। —কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে— ভবানীশঙ্কর। ভবানীশঙ্কর।... কিন্তু আমার নাম তো অভিজিৎ!... ভবানীশঙ্কর কে? আমি? কে আমি? অভিজিৎ নাকি ভবানীশঙ্কর!...

—গত জন্মে আমি ছিলাম ভবানীশঙ্কর। আমি একজন যুবক তান্ত্রিক। আমার পাশে এক যুবতী ভৈরবী। আমরা বসে আছি সাতসকালে বক্রেশ্বরের শ্মশানে। আমার কোলে শুয়ে একটা লম্বা কেউটে সাপ খেলা করছে। ভৈরবীর পাশে কালো কুকুরটা জিভ বের করে বসে রয়েছে।... হঠাৎ নির্জন শ্মশানে একজন লোক এল। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। প্রায় ৬ ফুট দীর্ঘ, কালো মজবুত চেহারার। লোকটার নাম মনোহর। খালি গা, পরনে খাটো ধুতি। লোকটা থাকে দুবরাজপুরে, ভাগচাষি। মনোহর আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চোখে আগুন জ্বলছে। সে আমাকে বলছে, ভবানীশঙ্কর, তোর সাধনার স্বার্থে তুই আমার ১২ বছরের ছেলেটাকে বলি দিয়েছিস। তোকে শাপ দিচ্ছি, তুই সামনের জন্মে পুত্রশোকে উন্মাদ হবি। আমার মতোই পাগল হয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াবি। আর এ-জন্মেও তোর শীগগিররই পতন হবে— কদাচারী তান্ত্রিক, তুই নরকে যা—

আঃ আঃ— আমার সারা শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্যথায় আড়ষ্ট শরীর— আমি এখন অকূল সাগরে ভাসছি— ভেসেই চলেছি— কোনও এক মাতৃজঠরের দিকে— ওঃ কে যেন আমাকে জালে আটকেছে— জাল তুলছে— আমিও উঠছি— আমি উঠছি— না, আমি আর ভবযন্ত্রণা চাই না— আমি প্রবেশ করছি ব্ল্যাকহোলে—

কে যেন আমাকে ডাকছে। কে যেন আমাকে ঠেলছে। চোখ মেলে দেখলাম, দীপ্তি!... আমি খাটে শুয়ে রয়েছি। পাশে আমার ছেলে বসে হরলিক্স খাচ্ছে আর বই পড়ছে। অবাক হয়ে উঠে বসলাম, মাথাটা ভারী হয়ে আছে। দীপ্তি বলল, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাসন্তী চা করছে— ওঠো এবার—

আমি ফ্যালফ্যাল করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। দীপ্তি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, শরীর ঠিক আছে? কাল তো যেন মাতালের মতো অবস্থা! অবিনাশদা তোমাকে জড়িয়ে, ধরে ধরে নিয়ে এলেন। বললেন, অভিজিৎ এখন শোবে। ওকে আর ডাকবে না... তারপর তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, কিছু না বলেই চলে গেলেন। এদিকে, তুমি শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে বিছানায় উঠে বসলো। তাজ্জব কাণ্ড! সত্যি, একথা স্বীকার করতেই হবে, অবিনাশদার এলেম আছে। ছেলেকে ঠিক সুস্থ করে দিলেন তো। আমি তো ভাবতেই পারছি না, কী করে কী হলো! অবিনাশদা সত্যিই একজন মহৎ মানুষ।... অ্যাই, তুমি কিন্তু একদিন বলবে, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে, কী করলে! তোমরা কি কোনও আশ্রমে হোমযজ্ঞ করতে গিয়েছিলে?

আমি জবাব না দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাথরুমে গেলাম। ফিরে এসে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একবার অবিনাশের কাছে যেতে হবে।

আহিরীটোলায় বাস থেকে নেমে, এঁদো গলি ধরে হাঁটতে লাগলাম। বাড়ির সামনে এসে দেখলাম, মেইন গেট খোলা। অবিনাশ তাহলে বাড়িতেই আছে। বাড়িতে ঢুকে উঠোন পেরিয়ে ওর ঘরের সামনে গেলাম। দরজা বন্ধ। ঠেলতেই খুলে গেল। অবিনাশ শুয়ে আছে তক্তপোশে। আমাকে দেখে মৃদু হাসলো। আমি নড়চড়ে কাঠের চেয়ার টেনে ওর পাশে বসলাম। কথা না বলে, অবিনাশ বালিশের তলা থেকে একটা প্যাডের পাতা টেনে এনে আমার হাতে দিল। ঘরের দুটো জানালাই খোলা, যথেষ্ট আলো রয়েছে, তবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে চশমা বের করে, চোখে লাগিয়ে পরতে লাগলাম :

বন্ধু,

তোকে বলেছিলাম, আমি যে 'কাজ' করব, তার শুভাশুভ দুটো ফলই প্রকাশ হবে। শুভফল তুই পেয়েই গেছিস, কিন্তু অশুভ ফল কে নেবে? তোরই নেওয়ার বা পাওয়ার কথা, কিন্তু আমি তোকে এত ভালোবাসি যে তোকে আর কোনও দুঃখ-কষ্ট দিতে চাই না। তাছাড়া তোর ছেলে-বউ সংসারও তো আছে। আমার আবার কিছুই নেই, তাই ভেবেচিন্তে অশুভ ফলটা আমিই গ্রহণ করলাম। অতএব, কাল রাতেই আমি প্রত্যাশিত ভাবে শ্রবণশক্তি হারালাম। বধির হয়ে গেলাম আমি। যতদিন বাঁচব, বাইরের পৃথিবীরে কোনও শব্দ আমি আর শুনতে পাব না। তাতে কী, আমার অন্তরের শব্দব্রহ্ম তো যাবজ্জীবন আমাকে প্রবহমান জীবনের গান শোনাবে। যাক্ গে, বাকি জীবন তুই ভালো থাক, সুস্থ থাক, আমি এই কামনাই করি।

অবিনাশ

আমার মাথায় যেন বাড়িঘর ভেঙে পড়ল। অবিনাশ উঠে বসলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। কোনওক্রমে বলতে পারলাম, আমাকে ক্ষমা করিস। জন্মজন্মান্তরেও আমি তোর ঋণ কখনোই শোধ করতে পারব না। আমি শুধু দূর থেকে তোকে প্রণাম করব।... ■

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১৫

গঙ্গাফড়িং

পুকুর বা অন্য জলাশয়ের ধারে গঙ্গাফড়িং অনেক দেখা যায়। জলে যদি বাঁশ বা কাঠ পোঁতা থাকে, তবে এরা ডানা মেলে তার ওপর চুপ করে বসে থাকে। কখনও কখনও জলাশয় থেকে দূরেও এদের উড়তে দেখা যায়। চিল শকুন যেমন আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, এদেরও সে রকম অবিরাম উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। এরা ডানা কখনও গুটাতে পারে না।

অনেক জায়গায় এদের গঙ্গাফড়িং বা জলঝিঁঝি বলে। স্ত্রী ও পুরুষ উইয়ের ডানায় যেমন শিরার মতো দাগ কাটা থাকে, এদের ডানাতেও সেরকম দাগ থাকে। ডানাগুলি খুব স্বচ্ছ ও পাতলা। এরা আকারে দু'ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের গায়ের রং লাল, হলদে, সবুজ নানা রকম দেখা যায়। মাথাটা প্রায়ই শরীরের তুলনায় বড়ো এবং চোখ দুটোও বড়ো হয়। এদের এক একটা চোখে প্রায় বারো-চৌদ্দ হাজার চোখ দিয়ে তৈরি। সুতরাং বলতে হয় ওদের আটাশ হাজার চোখ আছে। অনেক পতঙ্গেরই এরকম হাজার হাজার চোখ আছে, কিন্তু গঙ্গাফড়িংয়ের চোখ অন্যদের চেয়ে অনেক উন্নত। আমাদের মাথায় দুটো বড়ো বড়ো চোখ আছে, কিন্তু এই চোখের গঠন এমন খারাপ যে, তা দিয়ে খুব কাছের বা খুব দূরের জিনিস দেখতে গেলে মুশকিলে পড়তে হয়। আমরা চোখের খুব কাছে বই রেখে পড়তে পারি না আবার দশ হাত দূরে বই রেখেও অক্ষর চিনতে পারি না। গঙ্গাফড়িংয়ের মাথার দু'পাশে যে দুই গাদা চোখ বসানো অছে, তার মধ্যে কিছু দিয়ে এরা কাছের জিনিস দেখে এবং কিছু দিয়ে দূরের জিনিস দেখার সময় কাজে লাগায়। কাজেই অন্য পোকার চেয়ে এদের দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশি।

উইপোকা গাছপালা ও বাঁশ-খড় খায়। গঙ্গাফড়িং এদের মতো প্রাণী হয়েও কিন্তু নিরামিষ খাবার ছোঁয় না। ছোটো ছোটো পোকা ও মশা-মাছি এদের প্রধান খাবার। ওড়বার সময় এরা কেবল ছোটো পোকারই খোঁজ করে। কাছে কোনও পোকা উড়তে দেখলে গঙ্গাফড়িংরা তার ওপর চিলের মতো ছোঁ মেরে ছ'খানা পা দিয়ে তাকে আটকে ফেলে। তারপর উড়তে উড়তেই শিকারটিকে দাঁত দিয়ে পিষে ফেলে খেয়ে নেয়।। এদের পা গুলো মুখের খুব কাছে সাজানো থাকে। এজন্য শিকার ধরে মুখে গুঁজে দেবার খুব সুবিধে হয়। গঙ্গাফড়িং পিঁপড়ে, বোলতা বা উইয়ের মতো হেঁটে বেড়াতে পারে না।

গঙ্গাফড়িংয়ের জীবনের কথা বড়োই অদ্ভুত। বাচ্চা অবস্থায় এরা খাল বিল বা পুকুরের জলে থাকে, তারপর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ হয়ে গেলে জল ছেড়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। স্ত্রী গঙ্গাফড়িং কখনই ডাঙ্গায় ডিম পাড়ে না। ডিম পাড়ার সময় হলে ধীরে ধীরে উড়ে পুকুরের পাশে যায় এবং জলে পোঁতা কোনও বাঁশ বা কাঠ বেয়ে জলে ডুবে যায়। তারপর জলের তলায় শেওলার গায়ে বা কাদার মধ্যে ডিম পেড়ে আবার উপরে উঠে আসে। কখনও কখনও জলের উপরকার লতা-পাতায় বসেই এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো আপনা থেকেই জলে পড়ে ডুবে যায়। জলে ডিম পাড়ার পর জলফড়িং আর ডিমের খবর নেয় না। সেগুলো জলের তলায় আপনা থেকেই ফুটে যায় এবং প্রত্যেক ডিম থেকে এক একটা বাচ্চা বের হয়। বাচ্চারা ছ'টি পা ও এক কিম্ভূতকিমাকার মুখ নিয়ে জন্মায়। মুখের নীচের ওষ্ঠখানি এত লম্বা থাকে যে, দেখলেই মনে হয় যেন সেটা একটা প্রকাণ্ড হাত। এই ওষ্ঠ সাধারণ সময়ে মাথার নীচে গুটানো থাকে। কাছে ছোটো খাটো জলের পোকা বা মাছ দেখলেই ওরা সেই ওষ্ঠ বাড়িয়ে শিকার ধরে খেতে শুরু করে। গঙ্গাফড়িংয়ের উৎপাতে ডাঙার পোকা-মাকড় যেমন অস্থির থাকে, এদের বাচ্চাদের উপদ্রবে জলের পোকারাও সে রকম ভয়ে ভয়ে থাকে।

শিশু অবস্থায় জলে থাকার সময় এদের কানকো থাকে না। শরীরে লেজ থেকে শুরু করে মুখ পর্যন্ত একটা নল আছে। লেজের ছিদ্র দিয়ে জল টেনে তারা সেই জল একটানা মুখ দিয়ে বের করতে থাকে। এই বড়ো নলের সঙ্গে অনেক ছোটো নলের যোগ থাকে। ফলে জলের অক্সিজেন সরু নল দিয়ে শরীরের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

গঙ্গাফড়িংয়ের বাচ্চারা এভাবে প্রায় একবছর জলের তলায় থাকে। কিন্তু অন্য পতঙ্গের মতো পুত্তলি অবস্থায় মড়ার মতো পড়ে থাকে না। এক বছর পার হলেই এদের গায়ের চামড়ার নিচে ডানা গজাতে শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ গঙ্গাফড়িংয়ের চেহারা পায়। এ সময় এরা আর জলে ডুবে থাকতে চায় না। জলের কোনও গাছপালা আঁকড়ে উড়তে শুরু করে। পোকা-মাকড় খেয়ে মানুষের খুব উপকার করে গঙ্গাফড়িং। এদের আয়ু মাত্র তিনমাস। তাই এদের কোনও ভাবেই মারা চলবে না।

জগদানন্দ রায়

ভারতের পথে পথে

ললিতগিরি

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধদর্শন ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল অনুচ্চ টিলার ললিতগিরি। খননকার্যের ফলে ললিতগিরিতে ওড়িশার প্রাচীনতম কারুকার্যময় ইটে গড়া বিশাল চন্দ্রাদিত্য বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। বিহারের চৈত্যে সোনা ও রুপোর নানান সম্ভারের সঙ্গে পাথরের ৫টি পেটিকায় তথাগত বুদ্ধের কেশ ও অস্থি পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রে কুষাণ ও ব্রাহ্মিলিপিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ধনুকাকৃতি খিলানওয়ালা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ৪টি বিহার, একটি বিশাল স্তূপও মিলেছে খননকার্যের ফলে। উদ্ধার হয়েছে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বিশালাকার বুদ্ধমূর্তি, প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা(কুরুকুল্লা), অবলোকিতেশ্বর, বসুধারা এবং মহাযান শাখার নানন দেব-দেবীর মূর্তি। গান্ধার ও মথুরাশৈলীর প্রভাব মেলে ললিতগিরির ভাস্কর্যে। ললিতগিরির বিপরীতে ওলাশুনি পাহাড়চুড়োয় ব্রহ্ম অবধূত অরখিত দাশের সমাধি, গুম্ফা ও আশ্রম রয়েছে। মাঘী কৃষ্ণা একাদশীতিথিতে মেলা বসে ওলাশুনি পাহাড়ে।

জানো কি?

- আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দেশ রাশিয়া।
- আয়তনে পৃথিবীর ছোটো দেশ ভ্যাটিক্যান সিটি।
- পৃথিবীর জনবহুল দেশ চীন।
- পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের শহর নরওয়ের হ্যামারফাস্ট।
- পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের শহর চিলির পুয়োটা উইলিয়াম।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু দেশ চিলি।
- পৃথিবীর ছিদ্রায়িত দেশ ইতালি। কারণ ইতালির মধ্যে ভ্যাটিক্যান ও সান ম্যারিনো দেশ অবস্থিত।

ভালো কথা

পিঁপড়ের একতা

সেদিন রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। সকালে দেখি আমাদের বাড়ির পাশের জমিটা জলে ভর্তি হয়ে পুকুরের মতো দেখাচ্ছে। সেই জলে বলের মতো চকচকে কী একটা ভাসছে। ছোটো কাকু বলল ওটা পিঁপড়ের দলা। ওরা আগে থেকেই বুঝতে পারে ওদের বাসা ডুবে যাবে। তাই বাচ্চা ও ডিম মুখে নিয়ে ওরা এক জায়গায় জমা হয়। তারপর বাচ্চা ও ডিমগুলো মাঝখানে রেখে পরস্পরের পা কামড়ে ধরে জলে ভাসতে ভাসতে ডাঙ্গায় আসে। সেখানেই গর্ত করে আবার ঘরসংসার শুরু করে। ছোটো কাকু কথা বলতে বলতেই পিঁপড়ের দলাটি ডাঙ্গায় এসে লাগল। তারপর সবাই পরস্পরের পা ছেড়ে দিতে শুরু করল। দেখি সত্যি সত্যিই ভিতরে অনেক ডিম ও ছোটো ছোটো বাচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে ওরা গর্ত করতে শুরু করল। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখি তখনও ওরা ঘর বানিয়েই চলেছে। বাচ্চা ও ডিমগুলো গর্তের ভিতরে নিয়ে গিয়েছে। ওদের একতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। মা বলল , ওরা সমাজবদ্ধ জীব।

সঞ্চমিত্রা মণ্ডল, চতুর্থশ্রেণী, লালদিঘিপাড়া, বীরভূম।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বর্ষার মজা

অনন্যা দাস, পঞ্চমশ্রেণী, মানিকচক, মালদা।

খরা গেল বর্ষা এল
গরম গেল দূরে
আমরা সবাই আনন্দেতে
সাঁতার কাটি পুকুরে।
কাঁঠাল পেকেছে, লিচু পেকেছে
আর পেকেছে আম
তারই সাথে গাছে ঝুলছে
থোকা থোকা জাম।

খরার সময় খুবই কষ্ট,
যেন গাছগুলি সব মরা
বর্ষার জলে তারাই আবার
পাতায় ফুলে ভরা।
বর্ষার সময় ভিজতে মজা
স্কুল যাওয়ার পথে
মজার জন্যই দিই না ছাতা
মাথায় কোনও মতে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

মূলে টান পড়ায় পাদ্রিদের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে

প্রণব দত্ত মজুমদার

সম্প্রতি দিল্লির আর্চবিশপ অনিল কুটোর এক বিবৃতি ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অনিল কুটো তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন— দেশ এখন এক ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলেছে, এক অশুভ শক্তির কবলে পড়েছে দেশ। দেশের মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা সংবিধানপ্রদত্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন— ''Protect our institution from the infiltration of the evil forces'' এবং নিদান দিয়েছেন— ''to observe a day of fast every Friday of the week by forgoing at least one meal and offering penance and all our sacrifices for our spiritual renewal and that of our nation.'' এবং আশা করছেন এতে ২০১৯-এ দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে— ''looks forward towards 2019 when we will have a new government''। অর্থাৎ তিনি তাঁর অনুগামীদের সপ্তাহে একদিন বিশেষ করে শুক্রবারে উপবাস বা একবেলা আহার ত্যাগ করে প্রার্থনা করতে বলেছেন যাতে করে ২০১৯-এ নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশ অশুভ শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পায়। এতে পরিষ্কার তিনি বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তার অনুগামীদের প্ররোচিত করেছেন। একজন আর্চবিশপের মুখ থেকে এরকম রাজনৈতিক বক্তব্যে অনেকেই অবাক হয়েছেন।

খ্রিস্টান পাদ্রিদের এইরকম রাজনৈতিক আচরণ অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও গুজরাটের বিধানসভা ভোটের সময় গান্ধীনগরের পাদ্রি টমাস ম্যাকওয়ান আবেদন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পরাজিত করার জন্য। ৫ জুনের দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে গোয়ার আর্চবিশপ Filipe Neri Ferrao অনুরূপ বিবৃতি দিয়ে বলেছেন— 'Indian Constitution is in danger' এবং তাঁর অনুগামীদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন— '—work hard to protect the Constitution.' এগুলো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; দিল্লির আর্চবিশপ নিজেই বিবৃতিতে বলেছেন দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় এরকম প্রার্থনা তাঁরা করেই থাকেন— ''It is our hallowed practice to pray for our country and its political leaders all the time, but all the more when we approach the general elections.''

আমরা সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আবেগপ্রবণ বাঙালিরা এই ফাদার, ব্রাদারদের প্রেমের সাগর বলে মনে করে থাকি। কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে ধর্মযাজকরা বহুকাল ধরেই সেবার আড়ালে অত্যন্ত চাতুরির সঙ্গে আমাদের দেশের ক্ষতি করে চলেছেন। আমাদের দেশের দারিদ্র্য কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, 'আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস কমিশন'কে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করে, ভারতের বিভিন্ন অনুন্নত গ্রাম্য এলাকায়, জনবাসীদের মধ্যে লেখাপড়া, খাওয়া-পরার প্রলোভন দিয়ে তাদের ধর্মান্তর করে নিরন্তর দেশের ডেমোগ্রাফির পরিবর্তন করে চলেছেন। ৫ জুনের দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত দিল্লী ইউনিভারসিটির প্রফেসর রাকেশ সিনহার একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে— ১৯০১ সালের বেঙ্গল সেন্সাস রিপোর্ট লিখছে— The great centre of Roman Catholic Missionary Enterprise in this province is the district of Ranchi where its converts exceed" 54,000 or about three fith of the total number of province.'। সেই প্রতিবেদনে রয়েছে— ১৯১১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্সাস কমিশনার খ্রিস্টান পাদ্রিদের সাফল্য দেখাতে গিয়ে লিখেছেন— ''The steady drain from the Hinduism is causing demographic erosion of the Hindus।'' সেই ধারা কিন্তু এখনো অব্যাহত রয়েছে। শুধু তাই নয়, এঁরা দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সুকৌশলে যোগাযোগ রেখে, বিদেশি ফান্ডের সাহায্যে, ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে বিভিন্ন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা সফল করতে সাহায্য করে চলেছেন।

Rajiv Malhotra ও Aravindan Neelakandan-এর লেখা 'Breaking India' বইটির ৬৫০ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন এই খ্রিস্টান পাদ্রিরা কীভাবে আমাদের দেশের

ফঃ ৬

কিছু দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সংগঠন, বিভিন্ন দলিত সংগঠন, বিভিন্ন খ্রিস্টান সংগঠন, ইউরোপ আমেরিকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ইউরোপ আমেরিকার বহু ফান্ডিং এজেন্সি, দেশের বহু এনজিও, দেশের কিছু তথাকথিত সেকুলার মিডিয়া এবং সাংবাদিক ইত্যাদির সঙ্গে এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে এবং ভারত নামক রাষ্ট্রটিকে ভেতর এবং বাইরে থেকে বিপর্যস্ত করে দিতে চাইছে; এমনকী ভারতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাইছে এঁরা।

এই খ্রিস্টান মিশনারিরা যেসব সংগঠনের সঙ্গে মিলে কাজ করছে তাদের কয়েকটি হলো, All India Christian Council (AICC), Christian Solidarity Worldwide (CSW), Dalit Freedom Network (DFN), Dalit Solidarity Ntework-UK (DSN-UK)।''CSW in Europe, DFN in the USA, and AICC in India are tightly coordinated in encouraging European and American government intervantion in India.'' (Breaking Inia, p-301). ২০০৮ সালে ওড়িশায় হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী লক্ষ্মণানন্দের খুন হওয়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু-খ্রিস্টান দাঙ্গা হয়েছিল। তখন এই সি এইচ ডব্লু এবং ডিএফএন শক্তিশালী 'ইউম্যান রাইটস ওয়াচ' গ্রুপের সঙ্গে একযোগে UK foreign Secretary, US Secretary of States, the French Foreign Minister, the European Commissioner for external relations ইত্যাদিদের কাছে একপেশে রিপোর্ট পাঠিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের উপর দোষ চাপিয়ে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিবৃতির দাবি জানিয়েছিল।

London Institue of South Asia (LISA)– একটি ভারত-বিরোধী প্রতিষ্ঠান। ''LISA is working as an important node in the UK is bringing together European Dalit Academics, Indian Dalit activists, anti-Indian secessionists and pan-Islamic forces in Pakistan'' (Breaking India p-305). এরা জম্মু ও কাশ্মীরের উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, খালিস্তানপন্থীদের আন্দোলন, অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে তাদের ওয়েবসাইট- এর মাধ্যমে সমর্থন জানায়। এরা প্রচার করে ''India is responsible for perpetual instability and economic misery in the entire region of South Asia.'' (Breaking India p-304).

আর একটি প্রতিষ্ঠান হলো— The Oxford Centre for Religion and Public Life (OCRPL). এটির সমস্ত ডাইরেক্টর নিয়োজিত হন খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠান বা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের মধ্য থেকে। এদের একটি মুখ্য কাজ হলো— তাদের কিছু পছন্দমতো সমাজকর্মী, কিছু পছন্দমতো সাংবাদিক ও পাদ্রি বেছে নিয়ে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে হেয় করে, নিন্দা করে Atrocity literature তৈরি করা।

'Gospel for Asia (GFA)' টেক্সাসে প্রতিষ্ঠিত সম্পদশালী এবং শক্তিশালী খ্রিস্টান পাদ্রিদের একটি প্রতিষ্ঠান। ভারতে এর ভালোরকম infrastructural network আছে। ''GFA indulges in political propaganda, floating conspiracy theories through its access to the vast missionary media network'' (Breaking India p-353).

আরও বহু সংস্থা আছে যেমন— Boston Theological Institute (BTI), Lutheran World Federation (LWF), World Council of Churches (WCC) ইত্যাদি।

''WCC aligns itself with the left-wing, including Marxists, in the developing nations– In the case of India, WCC has been supporting and funding the Maoist- Christian insurgency in the strategic Northeast. Thus the rightwing strategy utilizes the left-wing for tactical support'' (Breaking India p-314).

চেন্নাইয়ে আছে Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute. এর মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন জাতি উপজাতি সম্পর্কে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করে। পাদ্রিরা এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁদের জাল বিস্তার করে। ''The Catholic Church has a powerful political grip among the Christian fishermen in South India. It is very active in politics, using Latin American Liberation Theology Models ---all this is done in the guise of development. This has made the fishermen community, strategically placed along the long border of India, vulnerable to pulls of foreign forces.'' (Breaking India p-327).

লোকশ্রুতি, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা অর্থ, সম্মান, পুরস্কার প্রতিপত্তির লোভে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে চলেছেন। দেশের কোনও ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা ওরা চিন্তা করেন বলে মনে হয় না। যেমন— বামপন্থী ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার।''Romila Thapar has bocome a powerful tool to reject the historical and cultural continuities that unite India and its Civilisation.'' (Breaking India p-259) তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৮ সালে তাঁকে মিলিয়ন ডলার 'ক্লুজি প্রাইজ' দেওয়া হয় যা সাধারণত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের দেওয়া হয়ে থাকে। একজন বামপন্থী জ্ঞানীকে কেন পাদ্রিদের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার দেওয়া হলো এ থেকেই পুরস্কার প্রদান কারীদের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আর এক বুদ্ধিজীবী— মীরা নন্দা। তিনি একজন বায়ো- টেকনোলজিস্ট। পরে হিউম্যানিটিজে পিএইচডি করেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতির তীব্র সমালোচক। তাঁর মতে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি অবৈজ্ঞানিক এবং নাৎসি মনোভাবাম্পন্ন। তিনি হিন্দুত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনারও তীব্র সমালোচক। এই সমস্ত ব্যাপারে তিনি প্রচুর

লেখালেখি এবং বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের কাছ থেকে 'জন টেম্পপ্লিটন ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ ইন রেলিজিয়ন অ্যান্ড সায়েন্স (২০০৫-০৬)' লাভ করেন তিনি।

বিজয় প্রসাদ— বামপন্থী শিক্ষাবিদ, ডাইরেক্টর অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ট্রিনিটি কলেজ, হার্ডফোর্ড। তাঁর মতে— ''Modern Hinduism is fascism and racism. It is the origin of what we would call modern facism." (Breaking India p-263).

অঙ্গনা পি চ্যাটার্জি— Associate Professor, Social and Cultural Anthropology, California Institute of Integral Studies (CIIS). ওড়িশার দাঙ্গার ব্যাপারে তিনি একপেশে তথ্য (যা কিনা এআইসিসি থেকে সংগৃহীত এবং যাতে দাঙ্গায় জড়িত 'মাওবাদী ও খ্রিস্টান পাদ্রিদের অশুভ আঁতাতের' কথা চেপে দেওয়া হয়েছিল) 'ইউ এস কমিশান অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম'-এর কাছে পেশ করে ভারতের ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন। ভারত সরকারের কাছেও ওইসব তথ্য পেশ করে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীমতী চ্যাটার্জি কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। George Washington University-তে পাকিস্তানি ছাত্র ও পাকিস্তানি এমব্যাসি আয়োজিত কাশ্মীর সম্বন্ধে এক আলোচনাচক্রে তিনি ভারতকে দোষারোপ করে বলেন, ভারতই কাশ্মীরের জমি দখল করে রেখেছে ও ভারতের এই ভূমিকার জন্য কাশ্মীরে হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সঙ্কট ক্রমশই বাড়ছে।

আই এম সি (ইন্ডিয়ান মুসলিম কাউন্সিল), আমেরিকার বুকে ভারতীয় মুসলমানদের হয়ে কথা বলার একটি সংস্থা। ভারতের ব্যাপারে ইউ এস গভর্নমেন্টের পলিশিকেও এরা প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। এই আই এস সি, ২০০৮ সালে অঙ্গনা চ্যাটারর্জিকে 'Tipu Sultan' পুরস্কার প্রদান করে। বুকার প্রাইজ বিজয়িনী বিখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতী রায়। তিনি তো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বুকে মাওবাদী কার্যকলাপকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। তাঁর মতে মাওবাদী আন্দোলন সর্বহারাদের আন্দোলন এবং এর জন্য ভারত সরকারকেই দায়ী করেন ''The Booker prize winner described the Maoist insurgency as one between haves an have-nots, in which the India govenment needs and enemy; and it has chosen the Maoist" (Breaking India p-390).

দেশি বিদেশি নামকরা কিছু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্র, অধ্যাপক, কিছু ডিপার্টমেন্ট জড়িয়ে আছে এইসব কুকর্মের সঙ্গে। তাঁরা তাত্ত্বিক ও বৌদ্ধিক শক্তির জোগান দিয়ে চলেছেন ভারতবিরোধী কাজে নেট-ওয়ার্কে যুক্ত সবাইকে। যেমন Department of religion-Denmark University 'Department of Social Anthropology, University of Stockholm, City University of New York, University of North Carolina ইত্যাদি। আমাদের দেশে জেএনইউ, জেএএমআইএ, এএমইউ, জেএনইউ ইত্যাদির বেশকিছু ছাত্র অধ্যাপকের ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। না হলে ওই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে আওয়াজ উঠবে কেন— 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি', 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' ইত্যাদি? দেশকে টুকরো করার অধিকারটা আমাদের সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে কি?

এই সমস্ত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদি নানারকম সমাজসেবামূলক কাজের আড়ালে কোটি কোটি টাকা পায় বহু বড় বড় বিদেশি কোম্পানি থেকে। সেই টাকার একটি বড় অংশ ব্যয় হয় ভারত-বিরোধী কাজে। এইসব ফান্ডিং এজেন্সির মধ্যে জগদ্‌বিখ্যাত Ford Foudation এবং Rockfeller Foundation ও আছে। কাজেই এঁদের টাকার অভাব নেই।

১৯৯৮ সালে আমেরিকায় পাশ হয় The International Relegious Freedom Act (IRFA). এর আসল উদ্দেশ্য হলো— ''to facilitate mechanism to bind the Christian populations in the developing nations to right-wing Christian Organisations in the United States.'' (Breaking India p-269). তৈরি হয় 'ইউ এস কমিশান অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়নস ফ্রিডম (ইউ এস সি আই আর এফ)। বিভিন্ন আমেরিকান গ্রুপ এই USCIRF-কে ব্যবহার করে সেদেশের সেনেটকে প্রভাবিত করে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান গ্রুপও অনুরূপ ভাবে নানারকম আন্তর্জাতিক ফোরাম যেমন— Durban anti-racism Conference-2001, Geneva Conference-2009 ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে, এমনকী পার্লামেন্টকেও কাজে লাগিয়ে মানবাধিকারের নামে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে। বিশেষ করে ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা সংখ্যালঘুদের উপর যে কী ভয়ানক অত্যাচার উৎপীড়ন করে তার একটা ছবি আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরার কাজ করে। এতদিন ধরে এইসব কাজকারবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেশ ভালোভাবেই চলছিল। সমস্যা আরম্ভ হয়ে গেল যখন থেকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলো। এইসব দেশবিরোধী কাজকারবারের উপর নজরদারি বেড়ে যাওয়াতেই চার দিক থেকে এইসব নেট-ওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কেন্দ্র থেকে মোদী সরকারকে সরাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে খ্রিস্টান পাদ্রিরাও যুক্ত আছে এর সঙ্গে। বন্যার সময় গর্তে জল ঢুকলে যেমন সাপ ব্যাঙ পোকা মাকড় সব বেরিয়ে আসে, তেমনি মূলে টান পড়ায় এরাও সব প্রকাশ্যে চেঁচামেচি আরম্ভ করেছে। ভালোই হয়েছে। মানুষ এদের চিনতে পারছে। ■

মালদায় প্রাপ্তবয়স্কের বিয়েতেও পুলিশের হয়রানি

সংবাদদাতা ॥ মালদা জেলার চাঁচল হানার দেবীগঞ্জ বগজনার প্রকাশ দাস পাশের গ্রামের মুন্নিমা ইয়াসমিনকে বিয়ে করার পর দীর্ঘদিন থেকে গ্রামছাড়া। বর্তমানে তাঁরা প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছেন। গত ৫ মার্চ প্রকাশ দাস মুন্নিমা ইয়াসমিনকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করার পর মুন্নিমার বাবা মোবিন আলি দুষ্কৃতী লাগিয়ে তাদের অপহরণ করে মেরে ফেলার চক্রান্ত করে। একথা জানতে পেরে তারা গ্রাম থেকে পালিয়ে যায়। মেয়ের বাবা চাঁচল থানায় অভিযোগ করেন তাঁর মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। থানার আই সি জামিন অযোগ্য ধারায় প্রকাশ দাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। তারা উভয়েই সাবালক এবং রেজেস্ট্রি বিয়ের কপি চাঁচল থানা, জেলা এস পি, এম ডি ও-কে জানানো সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয়। এদিকে বাদল প্রামাণিক নামে একজন হাইস্কুলের

প্রকাশ দাস ও মুন্নিমা ইয়াসমিন।

শিক্ষকের সঙ্গে প্রকাশ দাসের বন্ধুত্ব থাকায় তাকেও অপহরণের কেস দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে তারা শিলিগুড়ি কমিশনারের কাছে গিয়ে নিজেদের বিয়ের প্রমাণপত্র জমা করেছেন এবং বাড়ি ফিরে যাওয়ার আবেদন করেছেন। ম্যারেজ সার্টিফিকেট-সহ কমিশনারের স্বাক্ষর করা কাগজপত্র চাঁচল থানায় পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে প্রকাশের বাবাকে পুলিশ মিথ্যা কেস দিয়ে গ্রেপ্তার করে জেল হেফাজতে রেখেছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য মুন্নিমা ইয়াসমিন দীর্ঘ দু' বছর ধরে ভালবাসাতো প্রকাশ দাসকে। তাদের বিয়েতে আমরা আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু মেয়ের বাবা যেভাবে প্রকাশের পরিবারকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে হয়রানি করছে তা কাম্য নয়। একজন হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছে বলেই এমন অত্যাচারের ঘটনা হচ্ছে বলে তারা মনে করছেন।

কাশ্মীরে এবার পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাকিস্তানি জঙ্গিদের হাতে নিহত রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ান আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কাশ্মীরে পাক-বিরোধী স্লোগান শোনা গেল। আওরঙ্গজেবের শেষ যাত্রায় স্লোগান উঠল, 'কাশ্মীর ভারতের। পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে হাত ওঠাও।' পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানও শোনা গেল। নিহত জওয়ানের পরিবারের লোকজনেরাও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং ধিক্কার প্রকাশ করেছে। ইদের মাত্র দুদিন আগে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ান আওরঙ্গজেবকে কালামপোরার কাছে অপহরণ করে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। পরে পুলওয়ামা জেলার কালামপোরার থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটি স্থানে আওরঙ্গজেবের বুলেট বিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের যে দলটি হিজবুল মুজাহিদিন কমান্ডার সমির টাইগারকে খতম করেছিল, আওরঙ্গজেব সেই দলের সদস্য ছিলেন। গত ১৪ জুন আওরঙ্গজেব শোপিয়ান থেকে রাজৌরি যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারি গাড়িতে চেপেছিলেন। পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে জঙ্গিরা তাঁকে অপহরণ করে।

ইদের দিন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা কফিনবন্দি আওরঙ্গজেবের দেহ তাঁর গ্রাম সালানিতে নিয়ে যান। পুরো পাহাড়ি পথ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত কফিনটি ঘাড়ে করে বহন করে নিয়ে আসেন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আওরঙ্গজেবের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত অজস্র মানুষ দাবি তোলেন— সেনাবাহিনীকে এই হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে হবে। আওরঙ্গজেবের শোকার্ত পিতা মহম্মদ হানিক বলেন, 'যারা আমার সন্তানকে হত্যা করেছে, আগামী ৭২ ঘণ্টার ভিতর তাদেরও খতম করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, কাশ্মীরের বিষয়ে কোনওরকম দুর্বলতা না দেখিয়ে কড়া পদক্ষেপ করুন। এইসব খারাপ লোকদের খতম করে কাশ্মীরকে পাপমুক্ত করুন। কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ পাকিস্তানকে দায়ী করেছেন নিহত আওরঙ্গজেবের পিতা। তিনি বলেছেন, 'কাশ্মীর আমাদের, ভারতের। এখানে কেন পাকিস্তানের পতাকা উড়বে? এখানে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা উচিত।'

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য কথা বলে রাজনীতি করছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লিতে সম্প্রতি নীতি আয়োগের পরিচালন সমিতির যে বৈঠক বসেছিল সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না যাওয়ায় দিল্লির লেফটেনান্ট গভর্নর সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। এই খবরটি বাজারে চাউর করে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এই সূত্রে অনিল বিজলের (গভর্নর) পক্ষে দাঁড়িয়ে নীতি আয়োগের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অমিতাভ কান্ত এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানানোর পাশাপাশি এও জানান যে, দিল্লির বিশেষ আইন অনুযায়ী সরকারের নির্ধারিত ও মনোনীত কোনও ব্যক্তি ছাড়া কেউই এই গভর্নিং কাউন্সিলের সভায় যোগ দিতে পারেন না।

কোনও এক সাংবাদিকের ট্যুইটারে ফেক নিউজের ভিত্তিতে কেজরিওয়াল গভর্নরকে অভিযুক্ত করে হুংকার দেন তিনি কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে নীতি আয়োগের বৈঠকে যেতে বলেননি। গভর্নর তাই বেআইনি কাজ করেছেন। সূত্র অনুযায়ী দিল্লিতে গত শনিবার তাঁর ধরনার সপক্ষে

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি সমেত আরও তিন মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন পাওয়ায় বাংলায় যাকে বলে কেজরিওয়াল সাপের পাঁচ পা দেখে ফেলেন।

প্রসঙ্গত, কয়েকমাস আগে গভীর রাতে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্য সচিব অংশু প্রকাশকে তাঁর বাসভবনে ডেকে পাঠান। দায়বদ্ধ আমলা অংশুপ্রকাশ আদেশানুসারে সেখানে হাজির হলে মুখ্যমন্ত্রীর লোকজন তাঁকে গালিগালাজ করার সঙ্গে তাঁর ওপর দৈহিক আক্রমণও চালায়। এরপর থেকেই আমলারা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করতে পারলে তাঁরা আপ সরকারের মন্ত্রীদের বৈঠক বয়কট করবেন। কোনও ক্ষমা প্রার্থনা হয়নি। কোনও নিরাপত্তার আশ্বাসও মেলেনি। তাই ধর্মঘট নয়, আমলারা কেজরির গুণ্ডাশ্রেণীর মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে আতঙ্কিত বোধ করছেন। কেজরি স্বভাবসিদ্ধ মিথ্যে ভাষণে অভ্যস্ত প্ররোচনার ধুয়ো তুলে দিতে চাইছেন।

রাজধানী সূত্রে খবর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই সুযোগে দিল্লি গিয়ে মোদীর মুণ্ডপাত করতে ছাড়েননি। মজার কথা, তিনি কংগ্রেসকে এই সূত্রে কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেও কংগ্রেস সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, কেজরিওয়াল দিল্লির সাংবিধানিক খুঁটিনাটির কিছুই বোঝেন না, গভর্নরের অসহযোগিতার অভিযোগ তাই সম্পূর্ণ মিথ্যে।

কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতি অতিক্রান্ত, জঙ্গিদের নিকেশ করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংঘর্ষ বিরতির মেয়াদ শেষ হয়েছে ইদের দিন। তারপর ৪৮ ঘণ্টাও ভালো করে কাটেনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরই মধ্যে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীকে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রকের তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেন, 'গত ১৭ মে কেন্দ্রীয় সরকার রমজান মাসের পবিত্রতার কথা মাথায় রেখে সন্ত্রাসদমন কর্মসূচি স্থগিত রেখেছিল। কিন্তু সংঘর্ষবিরতির এই সিদ্ধান্তকে সফল করে তোলার জন্য সমাজের সর্বস্তরের যে সহযোগিতা কাম্য ছিল তা পাওয়া যায়নি। জিহাদিরা সাধারণ নাগরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে গেছে। বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাও ঘটেছে। এর ফলে অনেকে মারা গেছেন। আহতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাই নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীকে অবিলম্বে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসদমন কর্মসূচি আগে যেরকম চলছিল এরপরও সেরকমই চলবে। আমাদের লক্ষ্য সন্ত্রাসমুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর। তাই রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা এগিয়ে আসুন। জিহাদিদের চিহ্নিত করে বাহিনীর হাতে তুলে দিন। জিহাদিদের প্রলোভনে বিভ্রান্ত যুবকদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে সাহায্য করুন।'

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে মতোবিরোধ চরমে ওঠায় বিজেপি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। রাজ্যে জারি হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন। প্রসঙ্গত, মেহবুবা মুফতি অনেকদিন ধরেই কেন্দ্রের সন্ত্রাসদমন কর্মসূচির বিরোধিতা করছিলেন। বস্তুত তারই চাপে রমজান মাসে অপারেশন অল আউট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। তার ফল হয়েছে মারাত্মক। অগ্রণী সাংবাদিক সুজাত বুখারি-সহ অনেকে মারা গেছেন। অভিযোগ, সংঘর্ষ বিরতির মেয়াদ আরও বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছিলেন মেহবুবা মুফতি। সেই কারণেই বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত।

একসঙ্গে ভোট চান প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে একইসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করার পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, একই সঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা গেলে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে। একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা নরেন্দ্র মোদী এই প্রথম বললেন তা নয়। প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই তিনি এই বিষয়টি নিয়ে মাঝে মাঝেই মুখ খুলেছেন এবং প্রতিবারই সব রাজনৈতিক পক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন লোকসভা-বিধানসভার ভোট একসঙ্গে করার পক্ষে সহমত হতে।

এর আগে ২০১৭ সালে নীতি আয়োগের বৈঠকেও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এই বিষয়টির উপস্থাপনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ও সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ জানান তিনি। এবারের সদ্য অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকেও একই সুরে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে নানাবিধ মতামত থাকতে পারে। বিভিন্ন মত থাকবে সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে একটি চর্চা শুরু হওয়া। কারণ, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী একটি বিতর্কের ভিতর দিয়েই সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছন যাবে।'

নির্বাচনের খরচ প্রতি বছর কেমন বেড়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে ১১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। আর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে খরচ হয়েছে ৪০০০ কোটি টাকা। এখন তো সারা বছরই কোথাও না কোথাও নির্বাচন লেগে আছে। ফলে, নির্বাচনের আয়োজন করতে গিয়েও তো সরকারের কোষাগার থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে না। এইরকম পরিস্থিতিতে যদি লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে করে ফেলা যায়— তাহলে খরচে অনেকটাই লাগাম দেওয়া সম্ভব।'

একসঙ্গে নির্বাচন করার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সারা বছরই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচন লেগে থাকার দরুন উন্নয়নের কাজও ঠিক মতো করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই একইসঙ্গে লোকসভা- বিধানসভার ভোট করার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা ভালো।'

প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন আই এ এস অফিসাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঠিক সেই দিন যখন কেজরিওয়াল ও তাঁর আপ দলের সদস্যরা দেশের প্রধানমন্ত্রী ও দিল্লির লেফেটেনান্ট গভর্নরের বিরুদ্ধে এককাট্টা হওয়ার প্রমাণ দেখাতে এক প্রতিবাদ সভা থেকে বিষোদ্গার করছিলেন, ঠিক তখনই দিল্লিতেই একত্রিত হয়েছিলেন দেশের মহাগুরুত্বপূর্ণ চাকুরে আই এ এস-দের সংগঠনের কিছু মুখপাত্র। কেজরিওয়াল তাঁর সভা থেকে কুৎসিত হল্লার পাশাপাশি আই এস-দের কাছে তাঁদের তথাকথিত ধর্মঘট তুলে নেওয়ার আবেদন রাখছিলেন। কেজরিওয়াল তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেন। সংবাদসূত্র অনুযায়ী রাজধানীর আই এ এস অ্যাসোসিয়েশন একই দিনে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, কেজরিওয়ালের অভিযোগ মতো তাঁরা আদৌ কোনও ধর্মঘট করেননি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক সুবিধে আদায়ের জন্য তাঁদের ঘাড়ে বন্দুক রাখছেন। চাকরি সূত্রে তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের অনুগত নন। তাঁরা অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ এবং তাঁরা আদৌ কোনও ধর্মঘট করেননি। এটি কেজরিওয়ালের মিথ্যে অভিযোগ। সংস্থার সম্পাদক শ্রীমতী মনীষা সাক্সেনা বলেন, যে কোনও সরকার বা যে কোনও রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুযায়ী নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে যান। অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করে তিনি বলেন এই চাকরির অন্তর্গত আমাদের সদস্যদের আজকের মতো অতীতে কখনও প্রকাশ্যে এসে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়নি। কিন্তু আজকে পরিস্থিতিকে এমনই বিষাক্ত করে তোলা হয়েছে যার ফলে আমরা বাধ্য হয়েই নিজেদেরকে প্রকাশ্যে এনেছি। কিন্তু সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে আমরা কিন্তু কেবলই দেশের আইন ও সংবিধানের কাছে দায়বদ্ধ। তাঁদের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কেজরিওয়ালের সরকারের প্রচারিত আই এ এস-দের ধর্মঘট করার মিথ্যে প্রচারটি সরাসরি সামনে চলে এল। এই সূত্রে মুখপাত্রটি জানান, চাকরির দায়বদ্ধতার কারণেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা সরকারের যথাযোগ্য ব্যক্তিদের গোচরে আনাই আমাদের দায়িত্ব। দিল্লির সংবিধানগত অবস্থান অন্যান্য অনেক ব্যবস্থার থেকেই আলাদা। আর এই ব্যবস্থার ওপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ-অধিকার নেই।

চীন-ভারত সম্পর্কের একটি গবেষণা পত্র

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

অমলেন্দু কুণ্ডু সম্পাদিত 'শ্যাডো অব দ্য ড্রাগন অ্যান্ড রিসেন্ট ডেভলমেন্টস' গ্রন্থটির মূল বিষয় উত্তর-পূর্ব ভারতের ওপর চীনের ছলে বলে কৌশলে প্রভাব বিস্তার এবং ভারতের প্রতিক্রিয়া। গ্রন্থটি চার ভাগে বিবক্ত--- চীন, সিকিম, দার্জিলিং এবং সাধারণ। প্রতিটি অধ্যায় চীন-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজিক সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত।

প্রথম অধ্যায়ের বিষয় চীন। তিনজন বিশেষজ্ঞ— অমলেন্দু কুণ্ডু, সনৎ মুখার্জি ও কে কে গাঙ্গুলি এ বিষয়ে লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, সবচেয়ে জটিল রাজনীতি সিকিম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘটে চলেছে। এর মূলে রয়েছে চীনের এই অঞ্চলগুলিকে কুক্ষিগত করার দুরভিসন্ধি। সেই সব সূক্ষ্ম বিষয় ওই তিন বিশেষজ্ঞ দ্বারা সবিস্তার আলোচিত হয়েছে। রচনাগুলি সাবলীল ভাষায় লিখিত হলেও তথ্যপূর্ণ এবং পাঠকদের গভীরভাবে উদ্দীপিত করবে। এই প্রবন্ধগুলি পড়ে চীনা রাজনীতি সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর জ্ঞান অর্জন করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সিকিম। ছ'জন পণ্ডিত ব্যক্তি অমলেন্দু কুণ্ডু, পি টি গিয়ামৎসো, তাপস গাঙ্গুলি, পবন চামলিং, বিনোদ আগরওয়াল ও সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখেছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, এই গ্রন্থের লেখকরা সিকিমে চীনের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রায় কিছুই আলোচনা করেননি। তাঁরা সিকিমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সিকিম অধ্যায়ের লেখকরা বেশি জোর দিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পবন চাবন চামলিংয়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর। ফলে অধ্যাটি পবন চামলিংয়ের প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। যা খুবই অবাঞ্ছিত। প্রকৃতপক্ষে অধ্যায়টি চীন সম্পর্কিত অধ্যায়টির মতো আকর্ষণীয় হতে পারেনি।

তৃতীয় অধ্যায়টির বিষয় দার্জিলিং। চারজন লেখক— অমলেন্দু কুণ্ডু, শঙ্কর সেন, নির্মলা ব্যানার্জি এবং স্মরজিৎ কুমার চ্যাটার্জি এ বিষয়ে লিখেছেন। প্রবন্ধগুলি উত্তম মানের। দার্জিলিংয়ের রাজনীতি বলতে গোর্খাল্যান্ড দাবি নিয়ে আন্দোলন। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের হোতা ছিলেন জি

এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং। বামফ্রন্ট সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করলেও শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠন করতে বাধ্য হয়। সুবাস ঘিসিং এর প্রধান হন। কিন্তু তাঁর স্বৈরাচারী কার্যকলাপে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক নেতা গর্জে ওঠেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিমল গুরুং। তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন করেন এবং গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন জোরদার করেন। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে এই আন্দোলন মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এই লক্ষ্যে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাকে ডি জি এইচ সি-র চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও পাহাড় শান্ত হয়নি।

চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়ের নাম সাধারণ। লেখক— বিভাস কুণ্ডু ও প্রদীপ কুমার চৌধুরী। এই অধ্যায়ে প্রদীপ কুমার চৌধুরী চীন-ভারত দ্বন্দ্বের ইতিহাস সংক্ষেপে কিন্তু সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন। চীনের পঞ্চশীল নীতির প্রতি অনাস্থা, ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিতে অস্বীকার, ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ, অরুণাচল প্রদেশ দাবি, ডোকলামে সামরিক ঘাঁটি তৈরি এবং ভারত কর্তৃক প্রতিরোধ ইত্যাদি সবিস্তার উল্লেখ করে পাঠকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এমন সুন্দর বইটিও কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নয়। গ্রন্থটি অমলেন্দু কুণ্ডু-সহ এক ডজন লেখকের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। সে হিসেবে এটি সম্পাদিত গ্রন্থ। কিন্তু অমলেন্দুবাবু সম্পাদক হিসেবে তা উল্লেখ করেননি। বইটি হাতে নিলে মনে হবে বইটির লেখক অমলেন্দুবাবু। এটি গ্রন্থ প্রকাশনা রীতির নিয়ম বহির্ভূত। লেখক শ্রীকুণ্ড যেন আত্মপ্রচারে বেশি জোর দিয়েছেন। বইটির ভূমিকা অংশে নিজের গৌরবগাথা পাতার পর পাতা জুড়ে ব্যক্ত করেছেন। এটি আত্মজীবনী বা জীবনী রচনার ক্ষেত্রে মানায়। এখানেই শেষ নয়, 'সাধারণ' অধ্যায়ে ড. বিভাস কুণ্ডু আদ্যন্ত অমলেন্দুবাবুর প্রশংসা করেছেন। বুঝি এটি অমলেন্দুজবাবুর বিষয়ে গ্রন্থ। ৩৯২-৩৯৩ পৃষ্ঠায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে তিনটি চিত্র দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক নেই। ১৯৫-১৯৮ পৃষ্ঠায় ২০১৯- এ পবন চামলিং আবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী হবেন সে প্রচার করা হয়েছে। এই ত্রুটিগুলি না থাকলে বইটি নিখুঁত হতো। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি চীন-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে একটি উজ্জ্বল আকর এবং আগ্রহীদের অবশ্যপাঠ্য।

শ্যাডো অব দ্য ড্রাগন অ্যান্ড রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টস। লেখক : অমলেন্দু কুণ্ডু। প্রকাশক : পোয়েটস ফাউন্ডেশন, কলকাতা। পৃ. ৩৯৯। মূল্য : ৭৯৯।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

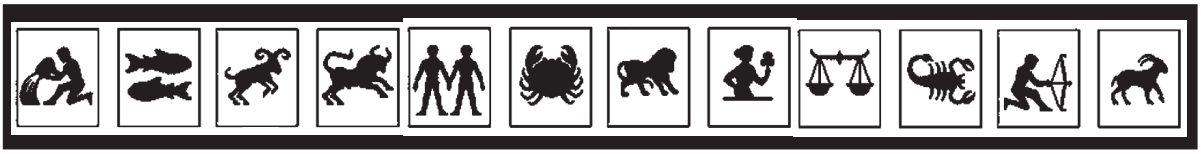

২৫ জুন (সোমবার) থেকে ১ জুলাই (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি-বুধ, কর্কটে শুক্র-রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। সোমবার রাত্রি ১১-৩০ মিনিটে বুধের কর্কটে প্রবেশ এবং বুধবার মঙ্গল বক্রী হবেন।

মেষ : পরিবহণ, চর্ম, বিনোদন, শিল্প ও খনিজ ব্যবসায় সার্বিক বিচারে অনুকূল সপ্তাহ। কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ন ও কর্তৃপক্ষের শংসা লাভ। সন্তানের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনায়াস সাফল্য ও সরকারি স্বীকৃতি। তীর্থভ্রমণ ও দানশীলতায় ভরপুর মন। নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা।

বৃষ : বসন্ত সমাগমের ন্যায় রমণীর লুব্ধ দৃষ্টিতে অস্থির চিত্ত ও হতাশা। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ প্রশস্ত। লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, তথ্যপ্রযুক্তি, বিচারক ও গবেষকের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির প্রসার ও মান্যতা। অসমাপ্ত কর্ম সমাধায় ব্যস্ততা ও মানসিক চাপ।

মিথুন : নানাবিধ জ্ঞান আহরণ, সাহিত্য প্রতিভার প্রসার ও বেকারদের কর্মসংস্থানের শুভ যোগ, আত্মীয় বাৎসল্য, আধ্যাত্মিক মনোভাব ও তথ্য অনুসন্ধানী দৃষ্টির প্রসার। স্বচ্ছ-ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গুরুজনের আশীর্বাদ লাভের সহায়ক। জুয়েলারি, স্টেশনারি ওষুধ, বস্ত্রব্যবসায়ীর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

কর্কট : বিদ্যায় মেধার বিকাশ ও কর্মকুশলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। পদোন্নতি ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা। প্রমোটিং, দালালি, ক্রীড়াবিদ ও সেনাধ্যক্ষের সার্বিক শুভ। চর্ম, অস্থি ও চোখের চিকিৎসার প্রয়োজন। সন্তানের সুকীর্তি ও গুরুজনের আশীর্বাদ লাভ।

সিংহ : গুরুজনে শ্রদ্ধা, সদ্ব্যবহার, চিন্তার স্বচ্ছতা, স্বজন বাৎসল্য, অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি দয়ার্দ্রহৃদয় ও গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভালো বন্ধু, স্বস্তিলাভ। সন্তানের মেধার বিকাশ ও নতুন কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। লাইফ পার্টনারের চিকিৎসায় ব্যয়।

কন্যা : জীবন খাতার ঝরা পাতায় অপ্রত্যাশিতভাবে বসন্তের পরশ। শিল্পী, কলাকুশলী, চিত্রসাংবাদিকের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। কর্মের যোগসূত্রে বিবাহ বন্ধনের যোগ। মধুর সুললিত ভাষণ বা বাক্‌চাতুর্যে নেতাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। রমণীর গুণে সাংসারিক সুস্থিতি।

তুলা : দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গঠমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা। নতুন ব্যবসা ও কর্মপরিকল্পনায় ইতিবাচক ফল। রিপ্রেজেন্টেটিভ ও যানবাহন কেনা বেচায় বন্ধুর সহযোগিতায় আয়ের গতি ত্বরান্বিত। পৈতৃক বাড়ির সংস্কার ও ভ্রমণ যোগ। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির বহুমুখী প্রসার।

বৃশ্চিক : নতুন কর্মসংস্থানে হতাশার পশ্চাৎভূমিতে উর্বর পলির প্রলেপ। সদাচার-সদ্ভাবনায় সমাজ প্রগতিমূলক কাজে অভিষ্ট লাভ। শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণ, আধ্যাত্মিক চিন্তা, চেতনা বৃদ্ধি, সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের প্রকাশ। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও প্রবাস।

ধনু : গৃহে শুভ অনুষ্ঠান, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পরিজন সমাবেশে উৎফুল্ল মন ও সৃষ্টির আনন্দে সুখী জীবন লাভ। বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকের জ্ঞানের বহ্নিশিখায় প্রতিভার বিচ্ছুরণ। রমণীদের প্রতি দুর্বলভাব ও প্রণয়ের পূর্ণতা।

মকর : কর্মক্ষেত্রে চাপ ও ব্যস্ততায় মানসিক অবসাদ, ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। জমি-বাড়ি-গাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা। যুক্তি ও আবেগমথিত ভাষার মাধুর্যে রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব বৃদ্ধি। খনিজ ও তরল ব্যবসায় শুভ। সন্তানের দিশাহীন চাল-চলন বিভ্রান্তির কারণ।

কুম্ভ : সততা, সরলতা, চিন্তার স্বচ্ছতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা, জ্ঞানী-গুণীর সমাদর, স্ত্রী-পুত্র লাভ, সুন্দরের পূজারি ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি। পুরাতন বন্ধু ও ছিদ্রান্বেষী বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

মীন : পার্থিব সুখে চঞ্চল মন। জোতিষ, ম্যাজিশিয়ান, কমেডিয়ান ও সাঁতারুদের কর্মকুশলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ফ্যাশনেবল ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। পুণ্যক্ষেত্রে ভ্রমণ, দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণের সফল প্রয়াস। সন্তানের চিন্তাভাবনা ও লেখাপড়ায় দোদুল্যমানতা।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য